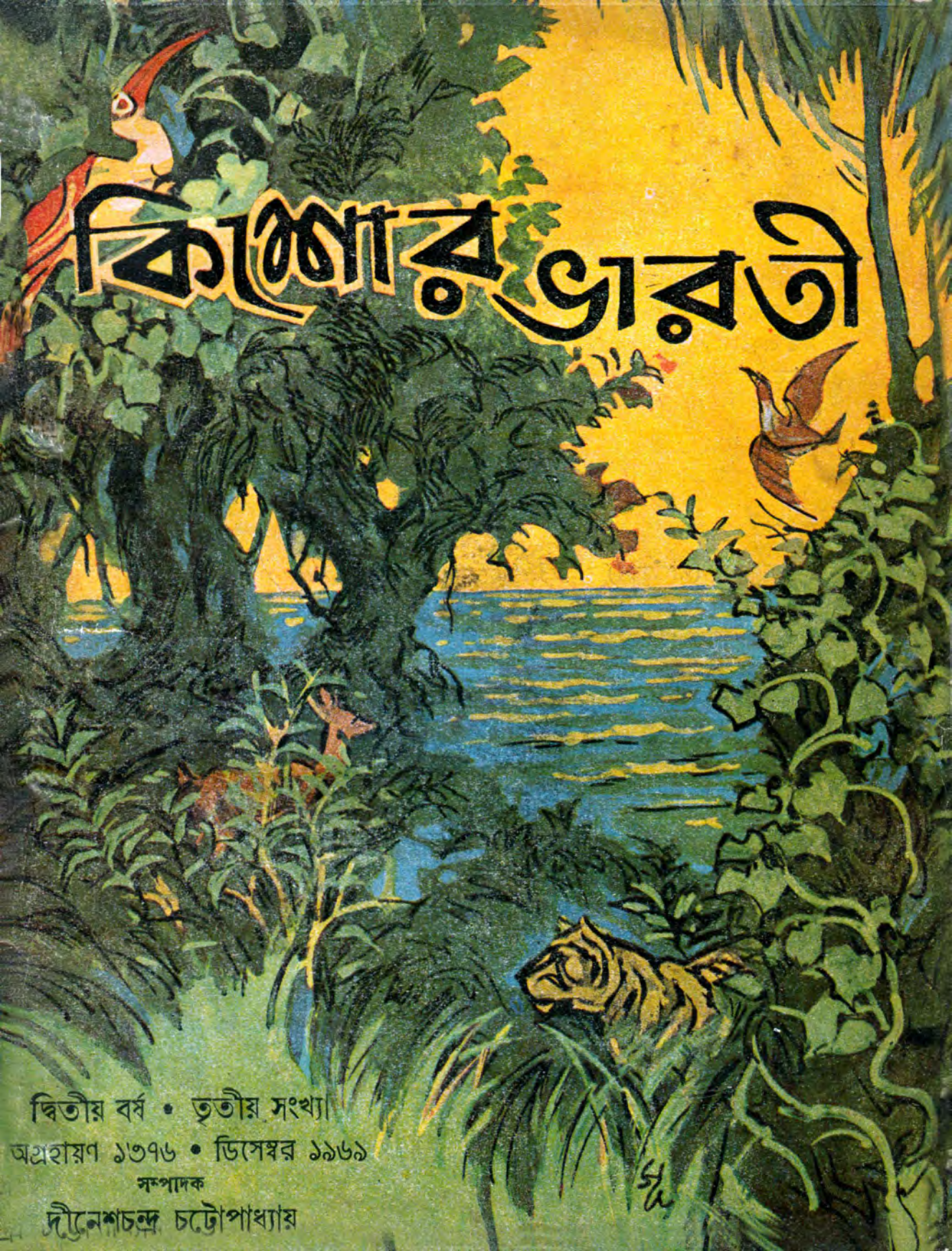

দ্বিতীয় বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ • ডিসেম্বর ১৯৬৯
সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

দেশ

দেশ পত্রিকা লিখেছেনঃ "কিশোরদের জন্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির আয়ু মাত্র এক বৎসর, এরই মধ্যে শিশু সাহিত্যের আসরে সে প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। .....**বাংলার প্রায় শতাধিক সাহিত্যিকের সচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটি কিশোরদের পূজার দিনগুলি আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারবে।**....."

যুগান্তর (সাময়িকী)

যুগান্তর (সাময়িকী) বলেনঃ "কিশোরদের মন আর চাহিদা মেটাবার মতো অথচ বর্তমান বিজ্ঞান,, শিল্প আর সাহিত্যের ক্রম-অনুযায়ী তাদের মানসিক পরিপুষ্টির সহায়ক পত্র-পত্রিকার অভাব এদেশে খুবই। এরই মাঝে 'কিশোর ভারতী' বর্ষকালের মধ্যেই এদিক থেকে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি যে সফল করতে পেরেছেন আর তাদের উদ্যম যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমান শারদীয়া কিশোর ভারতী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। **বাংলাদেশের প্রবীণ অনেক লেখকেরই লেখা এতে আছে। একথা বলা চলে যে, শুধু 'লেখার' জন্যই তাঁরা লেখেন নি, আমাদের কিশোরদের মনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা লিখেছেন।**. . তার উপর সুন্দর কাগজে, চিত্তাকর্ষক ছবিতে সংখ্যাখানি ভরপুর। যাঁদের ছবি আছে, তাঁরাও কুশলী ও কৃতী শিল্পী।....."

দৈনিক বসুমতী

দৈনিক বসুমতী-র সুচিন্তিত অভিমতঃ ".....ছোটদের উপযোগী যে কয়েকখানি শারদসংকলন হাতে পেয়েছি তার মধ্যে **এই বৎসরের "শারদীয়া কিশোর ভারতী" অদ্বিতীয়। এই রকম একখানি শিশুমনোপযোগী সুন্দর শারদসংকলন যে কোন বাড়ীতে, লাইব্রেরীতে, স্কুলে রাখা প্রয়োজন। রুচিসম্পন্ন সম্পাদনা শিশুদের নিঃসন্দেহে আনন্দ দেবে।**....."

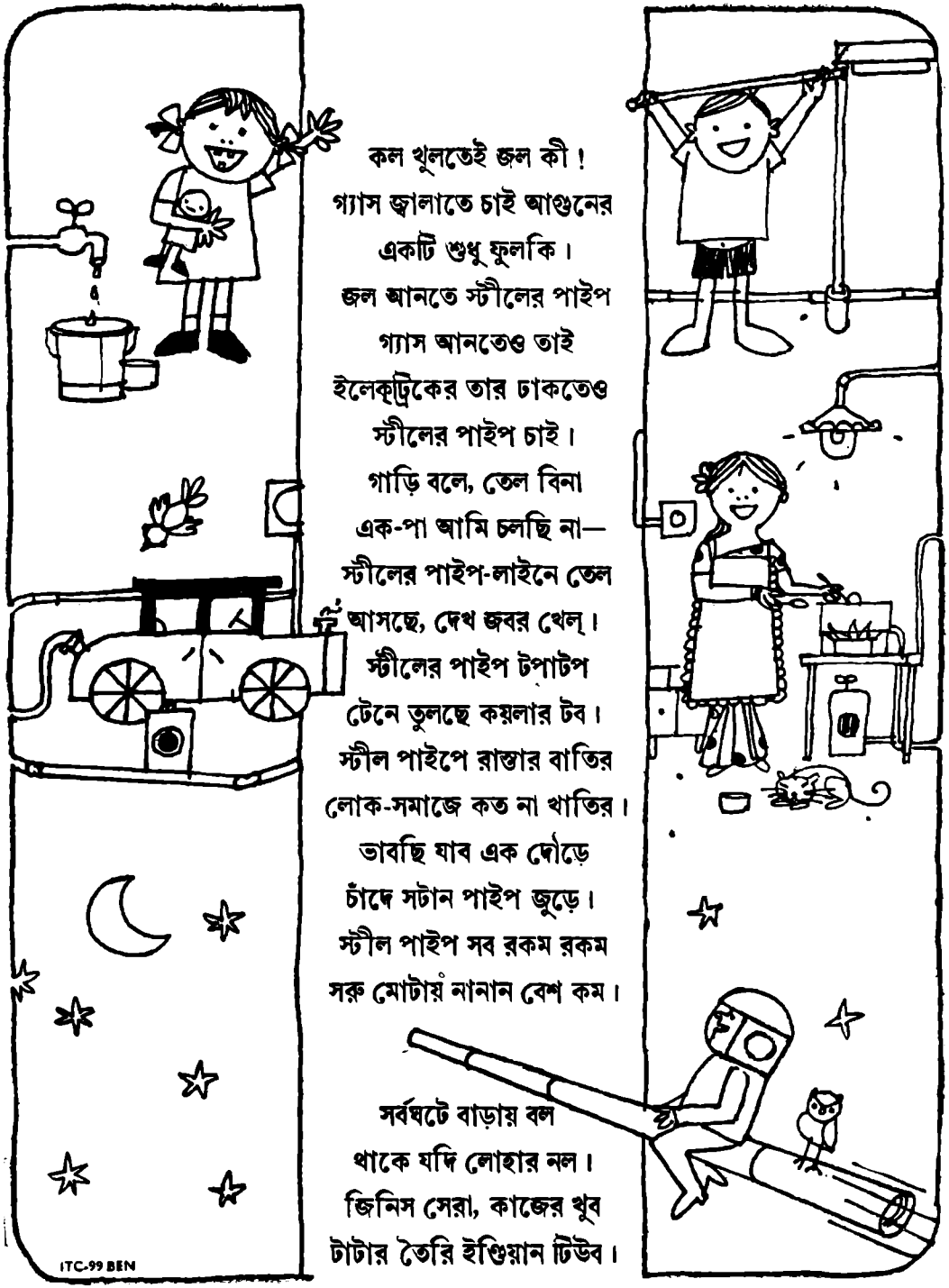

কল খুলতেই জল কী !
গ্যাস জ্বালাতে চাই আগুনের
একটি শুধু ফুলকি।
জল আনতে স্টীলের পাইপ
গ্যাস আনতেও তাই
ইলেকট্রিকের তার ঢাকতেও
স্টীলের পাইপ চাই।
গাড়ি বলে, তেল বিনা
এক-পা আমি চলছি না—
স্টীলের পাইপ-লাইনে তেল
আসছে, দেখ জবর খেল্।
স্টীলের পাইপ টপাটপ
টেনে তুলছে কয়লার টব।
স্টীল পাইপে রাস্তার বাতির
লোক-সমাজে কত না খাতির।
ভাবছি যাব এক দৌড়ে
চাঁদে সটান পাইপ জুড়ে।
স্টীল পাইপ সব রকম রকম
সরু মোটায় নানান বেশ কম।

সর্বঘটে বাড়ায় বল
থাকে যদি লোহার নল।
জিনিস সেরা, কাজের খুব
টাটার তৈরি ইণ্ডিয়ান টিউব।

বিদ্যোদয়ের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
এক জাহাজ গল্প

প্রথম সংগ্রহ **ময়ূরপঙ্খী** [৬·০০]
দ্বিতীয় সংগ্রহ **মকরমুখী** [৬·০০]
তৃতীয় সংগ্রহ **সাগরদাঁড়ী** [যন্ত্রস্থ]

ছোটদের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একাই এক অপরূপ গল্পের মায়াপুরী গড়ে তুলেছেন। কি সেখানে নেই? পরীদের পাখার শব্দের মত স্বপ্নঝিমঝিম গল্প আছে, আছে ইতিহাসের ঝলমলে রঙিন গল্প, রক্তে দোলা লাগানো গল্প দুরন্ত দুঃসাহসের, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করা গল্প রহস্যের, আছে গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ের গল্প, মজাদার কৌতুকের যেমন, তেমনি অতি মিষ্টি মন জুড়িয়ে দেওয়া গল্প আর আছে বিজ্ঞানের ভেলকি দিয়ে বানানো আশ্চর্য সব গল্প যাতে তাঁর জুড়ি নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সব গল্প একত্রে সংগ্রহ করে **এক জাহাজ গল্প** সংকলনে প্রকাশ করা হল। কিশোরদের জন্যে তাঁর যাবতীয় গল্পের (ঘনাদার গল্পের নমুনা সহ) এ-ধরনের সংকলন এই সর্বপ্রথম।

প্রথমে আঠারোটি বিচিত্র স্বাদের গল্পের পণ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে **ময়ূরপঙ্খী**। যশস্বী শিল্পী সুর্য রায়ের আঁকা ছোটয় বড়য় মিলিয়ে ছত্রিশখানি অপরূপ ছবি ও বহুবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট **ময়ূরপঙ্খী**-কে সাজিয়েছে নয়নাভিরাম সাজে।

ময়ূরপঙ্খী-র পরেই সাজোসাজো রবে বার হয়েছে **মকরমুখী** সতেরটি নানান রসের গল্পের সওদায় বোঝাই হয়ে। যেমনি আশ্চর্যসুন্দর সব গল্প, তেমনি চোখ-জুড়োন এর ছবির বাহার আর প্রচ্ছদপটের বুঝি তুলনা নেই। এর ছবিগুলিও এঁকেছেন সুর্য রায়। ছোটয় বড়য় এতে ছবির সংখ্যা চৌত্রিশ।

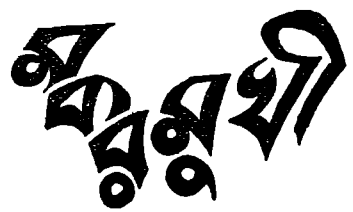

সবশেষে আসছে **সাগরদাঁড়ী**।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর কয়েকখানি বই

শুক্লে যারা গিয়েছিল [৩·০০] **ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস** [২·২৫] **গল্প আর গল্প** [২·২৫]

আরও কয়েকখানি বই

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র	৬·০০	সংকলন
সাইবিরিয়ার শেষ মানুষ	২·০০	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্বর্ণমুকুট	২·৫০	গোপেন্দ্র বসু
আনন্দমঠ	২·০০	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দারুমূর্তির রহস্য	১·৬২	মণীন্দ্র দত্ত
সুন্দরবনের চিঠি	১·৬২	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন : ৩৪-৩১৫৭

বিদ্যোদয়ের বই

ভয়ঙ্করের জীবন কথা

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহু অভিমতের একটি : "বিজ্ঞানের কাহিনী যে কত সরস ও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় পাই 'ভয়ঙ্করের জীবন কথায়'।...আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি, নামকরণের ইতিহাস আর পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির রোমাঞ্চকর বিস্ফোরণের কথা (লেখক) এত সহজ আর সুন্দরভাবে বলেছেন, যা সহজেই কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করবে। **'ভয়ঙ্করের জীবন-কথা' ১৯৬২ সালে অষ্টম শিশু-সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছে। লেখকের কাছ থেকে আরও এই ধরনের বিজ্ঞান আশ্রিত কাহিনী পাবার আশা রাখি।"** [যুগান্তর] [মূল্য ২·২৫]

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অনেক অভিমতের একটি: "দুটি রূপকথা—নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা। দুটি গল্পই ঠিক আমাদের পুরনো রূপকথার ভঙ্গীতে অথচ আধুনিককালের শিশুমনের উপযোগী ক'রে লেখা। ভাষা সুন্দর ও ঝরঝরে। অনেকগুলি ছবিতে ছোটদের মন ভরে উঠবে। ছাপা ও কাগজ ভাল। ছোটদের কাছে বইখানি আদৃত হবে বলেই বিশ্বাস।" [যুগান্তর] [মূল্য: ২·০০]

চোরের পাল্লায় চকরবরতি

শিবরাম চক্রবর্তী

'চোরের পাল্লায় চকরবরতি' শিবরাম চক্রবর্তীর এগারটি হাসির গল্পের সংকলন। শিবরামবাবুর লেখা সম্পর্কে বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধ পাঠকের কাছে নূতন করে কিছু বলা বাহুল্য। তাঁর অন্যান্য পুস্তকের মতো এ পুস্তকের গল্পগুলিও পড়ে হাসতে হাসতে প্রাণান্তকর (!) অবস্থা দাঁড়ায়। [মূল্য ৩·০০]

আমার ভালুক শিকার

শিবরাম চক্রবর্তী

বহু অভিমতের একটি: "বাংলা সাহিত্যে শিব্রাম চকরবরতী এক এবং অদ্বিতীয়। যাঁর নামেই অতো হাসির ছটা, তাঁর রচনার প্রতিটি লাইন লাফিং গ্যাসে ঠাসা তো থাকবেই।..... প্রতিটি গল্প পড়ে হাসির দমকা হাওয়া ছাড়তে না ছাড়তেই এগিয়ে যেতে হয় পরবর্তী গল্পে। 'কাষ্ঠকাশির চিকিৎসা', 'মাতুলতা', 'আমার ভালুক শিকার' কিংবা 'ঘটোৎকচ বধ'—এক বাক্যে স্বীকার করতেই হবে অতি চমৎকার। বইখানার প্রচ্ছদপট ছোট বড় সবার ভাল লাগবে আর ঠিক তেমনি এর সুন্দর বাঁধাই আর ছাপা। [রোশনাই] [মূল্য ৩·০০]

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী

স্বপনবুড়ো

অনেক অভিমতের একটি : "স্বপনবুড়োর এই বইটির মধ্যে মোট নটি কৌতুক কাহিনী সংকলিত হয়েছে। কাহিনীগুলির নাম 'নিতবরের নাকাল', 'সেয়ানে-সেয়ানে', 'চেখে দেখা', 'ও আমি আগেই জানতুম', 'নেমন্তন্ন নাও বাগিয়ে', 'বেড়ালের বোনপো', 'পরীক্ষা কী ঝকমারি', 'পুজোর উপহার', আর 'মন্দির প্রবেশ'। গল্পগুলি ছোটদের জন্য রচিত। তারা যে এই গল্পগুলি পড়ে আনন্দ পাবে, তাতে সন্দেহ নেই।...বইটির ছাপা সুন্দর। আরও সুন্দর প্রচ্ছদপট।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা] [মূল্য ২·৪০]

আলি ভুলির দেশে

সুখলতা রাও

অনেক অভিমতের একটি : "...সুখলতা রাও বহুদিন ধরে ছোটদের গল্প লিখেছেন এবং একদা শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি বড় একটা কেউ ছিলেন না। তাঁর হাত যে কত মিষ্টি, 'আলিভুলির দেশে'ই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আঠারোটি গল্পের সমষ্টি এ বইয়ে কল্পনা ও বাস্তবের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের নকশা ও গল্প, রূপকথা ও ফ্যাণ্টাসি রচনায় তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন।..." [দেশ] [মূল্য ৩·০০]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন ৩৪-৩১৫৭

কিশোর ভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৭৬/ডিসেম্বর ১৯৬৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা ৩৬৭

মামাবাবুর রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী : ধারাবাহিক উপন্যাস

পাহাড়ের নাম করালী—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪০১

রোমাঞ্চকর কাহিনী

বিভীষিকার কবলে—ননীগোপাল চক্রবর্তী ৩৬৮

কবিতাগুচ্ছ

অজ্ঞানে—শৈলেন দত্ত ৩৮২

রঙচঙে—অজয়কুমার নাগ ৩৮২

কে?—নবগোপাল সিংহ ৩৮২

কার্টুম-কাটুমী—রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৩৮৩

ঘেরাও—সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮৩

মরু-গিরি-কান্তারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঃ ধারাবাহিক উপন্যাস
দুরন্ত ঈগল—দীননাথ কাশ্যপ ৩৭৫

আজব হাসির গল্প
কুমীর, ভুঁড়োশেয়ালী আর শেয়ালপণ্ডিত—রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪১০

করুণ রসের গল্প
চরণ বৈরাগী—সন্দীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৬

ইতিহাসনির্ভর গল্প
মুখর অতীত—হাসিরাশি দেবী ৩৭১

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সরস কাহিনী
মোটর গাড়ির আদিকথা—এষা সিংহ ৪০৭

হাসির গল্প
মাছধরার গল্প—রবিদাস সাহারায় ৩৯২
একটি অভিযান—অমলেন্দ্রনাথ ঘটক ৩৮৪

বোম্বেটে কাহিনী
জলদস্যু—ভৈরবপ্রসাদ হালদার ৩৮৮

কবিতাগুচ্ছ
চড়াই ও খোকা—মদন রায় ৪০৫
সাত সকালে—চুণী দাশ ৪০৫
ঝিক্‌মিক্‌ ট্রেন—বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত ৪০৫
নিধিরামের খতিয়ান—পিনাকীরঞ্জন কর্মকার ৪০৬
পালোয়ান—বেলা দেবী ৪০৬
ফোটো তোলা—শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ৪০৬

আত্মত্যাগের দুঃসাহসিক কাহিনী
কর্তব্যের আহ্বান—অরুণাভ ভৌমিক ৩৯০

বিশ্বসাহিত্যের গল্প
কাঠের ঘোড়া—অমলকুমার মিত্র ৩৯৪

জীবজগতের গল্প
কাঠবোলতার গল্প—সলিল মিত্র ৩৭৪

গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর
এক চোখো (গল্প)—সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৪১৬
অনামী সৈনিক (গল্প)—বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ৪১৭
ভয় দেখানোর মাশুল—ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪১৯
অতীতের পাতা থেকে
ইতিহাসের দিনলিপি—মহাকাল রায় ৪১৩
খোলামনের মেলাতে
সুজনবন্ধুর বৈঠক ৪২০
ধাঁধা-হেঁয়ালি
সাহিত্য-ধাঁধা ... ৪২২
গত শারদীয়া সংখ্যার "অভিনব শব্দ-হেঁয়ালি প্রতিযোগিতা"র ফলাফল ৪২৩
খেলাধুলো
ব্যাটিং করার গোড়ার কথা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৪
খেলোয়াড় পরিচিতি ৪২৬
মজার ঘটনা ৪২৬
খেলার আসর—শ্রীসাংবাদিক ৪২৭
সওয়াল-জবাব
প্রশ্নোত্তর-বিভাগ—বাণী মৌলিক ৪২৮
বিজ্ঞান-সংবাদ
যন্ত্র-মানব রোবট—সুনীল সরকার ৪০৯
টুকরো হাসি
অন্ধকার—সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৩৭০
একটু হাসো!—উত্তমকুমার বটব্যাল ৩৮৭
একটু হাসো!—রাম চট্টখুন্ডী ৪০৪
সংবাদ-বিচিত্রা
রকম রকম জানবার কথা—বাদল বন্দোপাধ্যায় ৩৭৩
ছবিতে হাস্যকৌতুকের ধারাবাহিক গল্প
ডমরু-চরিত—শৈল চক্রবর্তী ৪১২
ছবিতে অভিনব সরস কাহিনী
লণ্ঠন ও ঘুটঘুটি—সূর্য রায় ৩৭৪
নন্টে আর ফন্টে—নারায়ণ দেবনাথ ৪০০
প্রচ্ছদ
পশ্চিম বাঙলার দক্ষিণে সুন্দরবন ও সমুদ্রের একটি দৃশ্য—**শিল্পী সূর্য রায়**

প্রাপ্তিস্থান

কিশোর ভারতী কার্যালয়॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
ডিএনবিএ ব্রাদার্স॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত **বইয়ের দোকান ও পত্রপত্রিকার স্টল**

মূল্য ঃ পঁচাত্তর পয়সা

শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

আমাদের কথা

স্নেহের বন্ধুগণ,—পরীক্ষা নিয়ে তোমরা অনেকেই বোধহয় খুব ব্যস্ত। অনেকের পরীক্ষা মনে হয় শেষ হয়েছে, অনেকের চলছে এখনো।

তারপর পরীক্ষা শেষ হলে? বাধাবন্ধহীন দিন—আনন্দে টইটুম্বুর। ক্লাশ নেই, পড়ার চাপ নেই—শুধু ছুটি আর ছুটি আর ছুটির হুল্লোড়। তারপর একসময় তা শেষ হবে, আসবে আর এক আনন্দ—নতুন ক্লাশে ওঠার আনন্দ।

যারা অবশ্য স্কুল ফাইনাল বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র, তাদের কোন ছুটি নেই। চোখে মুখে তাদের চিন্তার ছাপ। আসন্ন পরীক্ষার তাড়া আর কঠিন প্রস্তুতি। আর যারা কলেজে পড়ো, তাদের কারো কারো হয়তো পরীক্ষা চলেছে, কারো বা শেষ হয়ে গেছে।

আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, পড়াশুনোয় খেলাধুলোয় ও সবরকমের পরীক্ষায় তোমরা সত্যিকার সফলতা লাভ করো, দেহের ও মনের স্বাস্থ্যে আনন্দে ভরে উঠুক তোমাদের আগামী দিনগুলি। তোমাদের নিয়ে সমাজ ও দেশ যেন গর্ব করতে পারে।

খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ, গত ১৯শে নভেম্বর আবার দুই পৃথিবী-সন্তান চাঁদের পিঠে নেমেছিলেন। মহাকাশ পাড়ি দিয়ে চাঁদের দেশে গিয়েছিলেন তিন মহাকাশচারীঃ রিচার্ড গর্ডন, চার্লস কনরাড ও অ্যালান বীন। তাঁদের মধ্যে চাঁদে নেমেছিলেন চার্লস কনর‍্যাড ও অ্যালান বীন। এবারও চাঁদে মানুষ পাঠানোর কৃতিত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর তার বিজ্ঞানীদের। এই সাফল্যের জন্য তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাই। আশা করি, বিজ্ঞানের এই অবদান ও অগ্রগতি পৃথিবীর দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করার মন হবে তাঁদের।

তোমরা যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ো, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছো যে, দুর্ভাগ্যের অন্ধকার দেশকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে। রাজনৈতিক আকাশে ঘোরঘনঘটা। পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কি ভবিষ্যৎ, কেউ জানে না। চোদ্দটি দল নিয়ে গঠিত যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার, আজ সেখানে বিভিন্ন দল বা শরিকের মধ্যে বনিবনা নেই, ঝগড়া বিসম্বাদ মারামারি খুনো-খুনি চলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থাও কিছুমাত্র ভাল নয়। দেশের সবচেয়ে পুরনো পার্টি বা দল কংগ্রেস দু টুকরো হয়ে গেছে, ভেঙে পড়ছে খান্‌খান্‌ হয়ে। তাই কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার আজ টলোমলো। অন্যান্য অনেক প্রদেশের অবস্থাও তথৈবচ। সর্বব্যাপক অশান্তি, অনিশ্চয়তা, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও রক্তপাত দ্রুত যেন গ্রাস করছে ভারতভূমিকে।

এই অবস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক পুরনো বৎসর ১৯৬৯ সাল শেষ হতে চললো। জানি না আগামী বর্ষ আমাদের জন্য কি সন্দেশ বহন করে আনবে।

কিশোর ভারতীর প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রতিটি বিষয় তোমাদের কেমন লাগছে, তা জানার জন্য আমরা কতখানি ব্যগ্র তোমরা জান। আশা করি, তোমরা মতামত জানাতে ভুলবে না।

তোমরা সকলে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস্‌ গ্রহণ করো। ইতি—

তোমাদের বন্ধু
সম্পাদক

বিভীষিকার কবলে

ননীগোপাল চক্রবর্তী

একটা অবর্ণনীয় বিভীষিকা।

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি,—আর দু' মিনিট, চার মিনিট কি পাঁচ মিনিট—ব্যস্, তার পরেই সব শেষ! এমন ঘটনা যখন-তখন ঘটে না; কিন্তু ঘটে।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার,—খানিকটা মেল আর খানিকটা লোকাল। শিয়ালদা থেকে সোজা বারাকপুর। তারপর নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, রাণাঘাট এবং তারপরই কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর থেকে আবার গাধাবোট! প্রত্যেক স্টেশনেই তখন থামতে থামতে চলে এই গাড়ী।

কলকাতা থেকে পাঁচ লাফে যাঁরা কৃষ্ণনগর আসতে চান, এই গাড়ীই তাঁদের সুবিধা।

অতএব এই গাড়ীতেই ওঠা গেল। রাণাঘাটে এক কাপ চা খেয়ে বেশ পা ছড়িয়েই বসলাম।

বাইরের ঘোর অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে গাড়ী। এই ত চলে এলাম কৃষ্ণনগর! মাঝের কোন স্টেশনেই এ গাড়ী থামবে না। আর আধ ঘন্টাও নয়—তারপর কৃষ্ণনগর।

চিন্তাধারায় বাধা পড়ল চূর্ণীর ব্রীজ ছাড়ালেই, যখন গাড়ীর নীচে প্রচণ্ড ঠন্ ঠন্ শব্দ আরম্ভ হল—যেন বিরাট হাতুড়ী দিয়ে কেউ লোহার কড়ি কাটছে।

দরজা খুলে পাশের গাড়ী থেকে ঢুকলেন এসে চেকার। বিমর্ষ মুখ। একজন যাত্রী দেখাতে গেলেন তাঁর টিকিট। চেকার বললেন—না, টিকিটের ব্যাপার শেষ। আপনাদের বোধহয় ট্রেনের টিকিট আর কাটতে হবে না, আমারও টিকিট চেকিং শেষ!

শুনতে পাচ্ছেন?—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে।

ঃ ঐ ঠন্ ঠন্ শব্দ ত? খুব শুনতে পাচ্ছি।

ঃ চেঁচাতে পারেন? এই যা! ছেড়ে গেল লক্ষ্মী-নারায়ণপুর।

সে কি! চেঁচাবো মানে!—বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে।

নাস্ত্যেব গতিরন্যথা!—বললেন তিনি অত্যন্ত হতাশার সুরে—গাড়ী যে কোনও মুহূর্তে লাইনচ্যুত হতে পারে। চাকার পাশে যে মোটা রড থাকে, সেটা খুলে গিয়ে লাইনের উপর বা চাকায় অমনি করে ঘা মারছে।

তাহলে গাড়ী থামান।—অতি ব্যস্ত হয়ে চেকারকে অনুরোধ করি।

ঃ থামাবার মালিক কি আমি? থামাবে ত ড্রাইভার!

ড্রাইভার কি শুনতে পাচ্ছেন না!—জিজ্ঞাসা করেন আর একজন প্যাসেঞ্জার।

ঃ না, তিনি এই ঠন্ ঠন্ শব্দ মোটেই শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর কানের কাছে বয়লারের হুস্ হুস্ শব্দ তাঁকে আর কিছুই শুনতে দেয় না। হি ইজ কোয়াইট ইন দি ডার্ক, অথচ এই মুহূর্তে যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে যাবে, তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাঁকেই!

গার্ড সাহেব কি কচ্ছেন?—কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করেন আর একজন।—তিনি ত গাড়ী থামাতে পারেন—

ঃ পারেন, কিন্তু তিনি নিরুপায়। আমাদের মতই নিরুপায়। কেউ তাঁর হুইসেল শুনতে পাবে না, ফ্লাগও এই অন্ধকারে দেখবে না কেউ। পিছনের গাড়ীতে বসে তিনি এই বিপদের সংবাদটা ড্রাইভারকে জানাবেনই বা কি করে?.....এই রে, একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি লাগল বুঝি ট্রেনটায়!

এখন উপায়?—বিষম উৎকণ্ঠায় সবাই জিজ্ঞাসা করি চেকারকে।

খুব বিমর্ষভাবে উত্তর দেন চেকার—উপায় কিচ্ছু নেই। একমাত্র উপায় চিৎকার করা। সকলে মিলে চিৎকার করুন।

ঃ ঘোর অন্ধকার। মাঠের ভিতর দিয়ে ট্রেন বেগে ছুটে চলেছে। চিৎকার করলে কে শুনবে?

ঃ চিৎকার করবেন এখন নয়—যেই ট্রেন বীরনগরের কাছে আসবে, অমনি চেঁচাবেন—যদি স্টেশন-মাস্টার থামাতে পারেন।

চেন টানুন না!—উপদেশ দেন একজন কলেজের প্রফেসর।

ঃ চেন নেই। কালোবাজারীরা মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে চাল নিয়ে নেমে যায় বলে চেন কেটে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকারের বুকে নিরন্তর সেই ঠন্ ঠন্ শব্দ। গাড়ী ছুটছে। মেল ট্রেন যেভাবে ছোটে সেই ভাবেই ছুটছে। কারও মুখে কথা নেই। কখন বীরনগর স্টেশনের আলো দেখা যাবে, সেই প্রতীক্ষা করছে সবাই।

ঠন্ ঠন্ ঠন্! এ কি মৃত্যুর ঘণ্টা? অন্ধকার ভেদ করে কি আমরা মৃত্যুর দিকে ছুটেছি?.....চলন্ত গাড়ী থেকে লাফ দেবো? সে-ও ত মৃত্যুকেই ডেকে নেওয়া!

আলো! আলো দেখা যাচ্ছে বীরনগর স্টেশনের! কলম্বাসের সহযাত্রী নাবিকেরাও বোধহয় এত খুশী হয়নি আলো দেখে!

তখন থেকেই চিৎকার ঃ গাড়ী থামান! মাস্টার মশাই, থামান গাড়ী!—কয়েকটা কামরার লোক একসঙ্গে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে।

ট্রেন সুতীব্র এক হুইসেল দিয়ে এক নিমিষের মধ্যে স্টেশনটি ছেড়ে গেল। গাড়ী থামল না। স্টেশনের লোকেরা হয়ত মনে করল, আমরা ওদের ঠাট্টা করে বলছি ঃ মেল ট্রেন এটা। ক্ষমতা থাকে থামাও দেখি! ট্রেনের চপলমতি প্যাসেঞ্জাররা প্রায়ই এরকম ওদের বলে থাকে। অদৃষ্টের পরিহাস বোধহয় একেই বলে!

ঠন্—ঠন্—ঠন্! চেকার অন্য কামরা থেকে ছুটে এলেন আবার।

ঃ আপনারা আবার চেঁচান, যদি তাহেরপুরে গাড়ী থামাতে পারে। যে রকম জোরে গাড়ী ছুটেছে, বাঁচবার কিছুমাত্র আশা আর নেই আমাদের!

গলা শুকিয়ে এসেছে। হাত-পা যেন শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করি,—আচ্ছা, কোন্ জায়গার রডটা খুলেছে?

আপনি যেখানটায় বসে আছেন, ঠিক তারই নীচে। ওখানকার চাকাটাই আগে স্লিপ করবে—

কি সর্বনাশ! আর আমি তারই উপর বসে আছি! ভয়ে সরে বসতেই চেকার নীরস কণ্ঠে বললেন,—গাড়ী যখন উল্টে যাবে, তখন সব গাড়ীই একসঙ্গে যাবে, কেউই বাঁচবে না। সরে বসা নিরর্থক।

গাড়ী তাহেরপুরও ছেড়ে গেল।

ঠন্—ঠন্—ঠন্! প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পদক্ষেপ গুণছি আমরা! সম্মুখে বাদকুল্লা।

আচ্ছা, এমন হয় না যে, ড্রাইভার ভুল করে গাড়ী থামিয়ে দিল বাদকুল্লায়? আর সব গাড়ীই ত থামে সেখানে। ভুল করলে দোষটাই বা কি!

না, তা হয় না,—বলেন চেকারবাবু—ডাক্তার ঠিক ওষুধ দিতে ভুল করতে পারেন, কিন্তু ড্রাইভার স্টেশন ভুল করে না।

বাদকুল্লায় বুঝি এসে গেল গাড়ী। আবার আমরা চেঁচাই ঃ মাস্টার মশাই, গাড়ী থামান—গাড়ী থামান—

কিন্তু পূর্ব্ববৎ কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করে গাড়ী হুইসেল দিয়ে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে! কেউ আমাদের চীৎকারে কর্ণপাতও করল না।

আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম? মনে করতে পারি না নির্দিষ্ট কোনও মুখ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের মুখ যেন একসঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছে!

ঠন্—ঠন্—ঠন্! এ যেন ইন্‌স্‌কেপ রকের ঘণ্টা। চতুর্দিকে অন্ধকার, সম্মুখে মৃত্যু! চেকার গাড়ীর এক কামরা থেকে আর এক কামরায় ছুটোছুটি করছেন উন্মত্তের মত।

ভগবান রক্ষা করুন আমাদের! মাঝে আর কোন স্টেশন নেই, রক্ষাকর্তাও নেই কেউ এক ভগবান ছাড়া। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা বোধহয় ভগবানকেই ডাকছিলাম তখন। চরম মুহূর্তে ভগবানকে ডাকা ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই—সান্ত্বনাও নেই।

মন্দীভূত হয়ে এল গাড়ীর গতি। এইবার কৃষ্ণনগরে থামবে! দূরে আলোর মালা দেখা যাচ্ছে। স্টেশনের আলোকে এত সুন্দর আর কোনদিন মনে হয়নি।

অন্ধকার

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

এপাশের এক ফুটপাথ লোক 'গেলো গেলো...' বলে চিৎকার করে উঠলো। অবশেষে দেখা গেলো, যায় নি কেউ। শুধু উঠে গেছে ভদ্রলোকের গাড়িখানা ফুটপাথের ওপরে। আর কিছুটা উঠে গেলে যাদের যাবার কথা ছিল, তাদের তখন হল্লা করার সময় নয়। কেউ ভয়ে কাঁপছে, কেউ বা সদ্যপরা কবচটার দিকে তাকিয়ে ভাবছে রক্ষা কবচের কথা। একে কলকাতা, তায় বড়বাজার। লোক জুটে যেতে একটুও দেরী হলো না। সবাই ঘিরে ধরেছে ড্রাইভার ভদ্রলোককে। চারদিক থেকে চৌষট্টি রকমের প্রশ্ন ঃ 'নেশা করে গাড়ি চালানো হচ্ছে...?' 'দাদার বোধহয় ড্রাইভিং-এ এই হাতে খড়ি...?' 'দেবো নাইসেন্ কের্নাসিল্ করে' ইত্যাদি।

ড্রাইভার ভদ্রলোক কারও কথার কোন জবাব না দিয়ে হাত জোড় করে শুধু একটি কথাই বলে চলেছেন, 'অন্ধকার...অন্ধকার।'

'চালাকী পায়া হ্যায়, দিন-দুপুরমে অন্ধকার বলতা হ্যায়—হিন্দীজানা ভদ্রলোক আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসেন। ড্রাইভার ভদ্রলোক কিন্তু একটুও না ঘাবড়ে বললেন, 'দেখুন, আমায় মারুন ধরুন, যা ইচ্ছে করুন। আমি শুধু কয়েকটি কথা আপনাদের বলবো, ধৈর্য ধরে শুনুন। তারপর আপনাদের বিচারে যদি আমার প্রহারই পাওনা হয় পিঠ পেতে নেবো।' একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, 'আচ্ছা, গাড়ির চাকাগুলোকে যদি আমরা পায়ের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে ইঞ্জিনটাকে নিশ্চয়ই আমাদের হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কেন না, হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হলেই যেমন আমাদের পিণ্ডের ব্যবস্থা করতে হয়, গাড়িও অচল ইঞ্জিন বন্ধ হলে। তাহলে আমাদের চোখের সঙ্গে নিশ্চয়ই তুলনা করতে পারি গাড়ির হেড-লাইট দুটো? কিন্তু দেখুন, দুটোর কোনটাই আমার গাড়িতে নেই। তাই বলছিলাম না আপনাদের, ইচ্ছে করে কি গাড়ি ফুটপাথ চড়াও হয়েছে? আমার 'কার্' আসলে অন্ধ, অর্থাৎ, অন্ধ-'কার'। তাই তো দেখতে না পেয়ে বেপথে চলে গেছে।'

মুখর অতীত

হাসিরাশি দেবী

ষোড়শ শতকের সেই একটি দিন, যেদিন চাঁদেকান রাজ্যের সুসজ্জিত রাজসভায় তখনও মহারাজ প্রতাপাদিত্য এসে প্রবেশ করেননি।

সভাসদেরা সকলেই উপস্থিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে যার নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। এমন সময় মাঙ্গলিকের সুর বেজে উঠল। ঘোষক জানাল মহারাজের আগমন-সংবাদ। সভাসদেরা সচকিত হয়ে উঠল। পরিচিত পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য, উপবেশন করলেন নিজের আসনে।

সকলে দেখল, তাঁর মুখ আজ থমথমে; দুই ভ্রূর মাঝখানে দুশ্চিন্তার ছাপ।

এই রেখার অর্থ সকলেরই জানা, তবু প্রশ্ন করার মত দুঃসাহস কারও নেই। তাই সকলেই নির্বাক।

সভায় সকলের মুখের ওপর দিয়ে, মনোভাব যাচাই করার জন্যই যেন, দৃষ্টির স্পর্শ বুলিয়ে গেলেন মহারাজ। তারপর বললেন—আপনারা, অর্থাৎ যাঁরা আজকের এই সভায় উপস্থিত আছেন, আমি জানি, তাঁরা সকলেই এ রাজ্যের মঙ্গল-প্রার্থী। সেইজন্যই তাঁদের কাছে আমার একটি বক্তব্য আছে। যদি অনুমতি করেন, তাহলে বলি!

সভাসদেরা বিস্মিত, ভীত ও চমকিত হয়ে উঠলেন। রাজার মুখে এ কি আবেদনের সুর! কি তাঁর বলার কথা?

প্রতাপাদিত্য তখনও বলে চলেছেন—লোকে আমাকে বলে সাগরদ্বীপের রাজা। অর্থাৎ চারদিকের জলপথে এ রাজ্য সুরক্ষিত। কিন্তু আমি জানি, এ রাজ্য রক্ষার ভার কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ কিংবা রাজার ওপর নয়,—এই রাজ্যের সকলেরই সে বিষয়ে কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। আর তাঁরা তা প্রতিপালনও করেন যত্নের সঙ্গে। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। বলার কথা হচ্ছে যে, চট্টগ্রাম থেকে জনকয়েক বিদেশী ধর্ম-প্রচারক এখানে আসতে চান। আমি সম্মতি দিয়েছি এ কথা ভেবে যে, এ সম্পর্কে আপনাদের কারও অমত থাকবে না। তবু বিদেশী ত! তাই আপনাদের অভিমত জানতে চাই। আমি অবশ্য তাঁদের এ-ও জানিয়েছি যে, এদেশবাসীর ওপর কোনও জুলুম চলবে না—বিশেষ করে ধর্মের ওপর তো নয়ই।

সাধু! সাধু!—সভাসদ আর উপস্থিত ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের হর্ষধ্বনি শুনে মহারাজ প্রতাপাদিত্য একটু হাসলেন। তারপর বললেন—সব চাইতে বড় কথা কি জানেন? ভারতবাসীরা চিরদিনই অপরের ধর্মমতকে নিজেদের ধর্মের মতই শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে। সে উদার মতবাদ আমরাই বা গ্রহণ করব না কেন?—কাজেই.....

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শেষ কথাগুলি সভাজনের হর্ষধ্বনির মধ্যে ডুবে যায়।

মাথার ওপর একটা অবুঝ টিকটিকি ডেকে ওঠে—টিক্-টিক্-টিক্!

মহারাজ সহসা চুপ করে গেলেন।

এরপর কয়েকটা বছর কেটে গেছে দেখতে দেখতে। চাঁদেকান বা যশোরের মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে পর্তুগীজ পাদ্রীদের প্রথম গির্জা—যার খিলানের পর খিলানের মধ্য দিয়ে সুদৃশ্য সোপানশ্রেণী গিয়ে পৌঁছেছে প্রার্থনার হলঘরে। মাঝখানে তার উপাসনার বেদী—যার ওপর বহু দুর্লভ জিনিস সাজানো।.....

অন্ধকার রাত—গভীর। মধ্যরাত্রির প্রহর গণনার ঘণ্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু রাজা প্রতাপাদিত্যের চোখে ঘুম নেই। রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ দালানে তিনি পাদচারণা করছেন আর বার বার ফিরে তাকাচ্ছেন দূরের আলোকোজ্জ্বল গির্জার দিকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন মহারানী। শঙ্কিত তাঁর কণ্ঠস্বর—মহারাজ, আপনি এখনও জেগে!

—হ্যাঁ।

স্থির গম্ভীর গলার আওয়াজ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ঃ জেগে জেগেই তো চারিদিকটা দেখতে হয়, মহারানী! ঘুমোলে যে গির্জার আলোগুলো দেখতে পাব না!

কি ভেবে একটু হাসেন মহারাজ। সে হাসি যেন ক্ষোভের, দুঃখের। বলেন—ব্যাপারটা কি জান, মহারানী! আমিই যখন ও আলো জ্বালবার সুযোগ দিয়েছি, তখন নেভাবার সুযোগও খুঁজতে হবে আমাকেই। কারণ বাংলার দিকে ওত পেতে বসে আছে অনেকেই। বসে আছে ওরাও—ঐ বোম্বেটে পর্তুগীজরাও। আমি বাংলার এতটুকু জায়গার অধিকারী মাত্র। সেটুকুর অধিকারই শুধু নয়, সেখানকার মানুষকেও এদের অত্যাচার থেকে কি করে বাঁচাব—তাই চিন্তা। তাই ভাবছি আর ভাবছি। এই বাংলাই আমার জন্মভূমি। অথচ এর ওপর ওদের কারও মমতা নেই, মায়া নেই, দয়া নেই! বলতে পার, এই সব লুটেরার কবল থেকে একে কি করে বাঁচাব?

অন্তরের আকুতি যেন আর্তনাদের মত ছুটে আসতে চায়! অন্ধকারেও যেন প্রতাপাদিত্যের চোখের কোণ দুটো চক্ চক্ করে ওঠে জলের ছোঁয়ায়।

—মহারাজ!

—কোনও কথা নয় রানী! এক দিকে আমার বিপক্ষে দাঁড়াবার ষড়যন্ত্র করছেন মোগল বাদশাহ। অন্য দিকে মগদের রাজা সন্দ্বীপ জয় করে বাক্‌লা রাজ্যও অধিকার করেছে। এবার বাকি শুধু চাঁদেকান রাজ্য। তাই এ ভাবনা।.....

কোথা থেকে একটা রাতজাগা পাখি চীৎকার করে ওঠে। সচকিতে ফিরে তাকান মহারাজ প্রতাপাদিত্য। মনে হয়, যেন চাঁদেকানের অজস্র জলপথ ভরে উঠেছে মগরাজার আর পর্তুগীজদের যুদ্ধ-জাহাজে। নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে সতর্ক সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে ওরা!

একটা আর্তনাদ যেন গলা ফেটে বার হয়ে আসতে চায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অন্তর থেকে। রুদ্ধ আক্রোশে তাঁর হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ। অস্ফুটে উচ্চারণ করেন—মা! মাগো যশোরেশ্বরী—

দূত খবর নিয়ে আসে—সন্দ্বীপে পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়াইয়ে মগরাজার হার হলেও সৈন্য এবং জাহাজ ধ্বংসের ক্ষতি পর্তুগীজরা সামলাতে পারেনি। তাই ওদের কর্তা ডোমিনিক কার্ভালো জাহাজ মেরামত আর দলে নতুন সৈন্য ভর্তি করার জন্য শ্রীপুর থেকে গেছেন হুগলী বন্দরের দিকে।

বটে!—আনন্দে আর উত্তেজনায় দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের। অস্ফুটে উচ্চারণ করেন—হুগলী! সে তো বেশীদূর নয়! এ সুযোগ উপেক্ষা করা যায় না। কাঁটা দিয়েই তো কাঁটা তোলবার রেওয়াজ!

কিন্তু এ কথা অন্যের কানে যায় না। মৌন ইঙ্গিতে নিভৃত কক্ষে তাঁর আদেশ মত সুন্দর সহজ ভাষায় লিপি রচিত হয়—কার্ভালোকে চাঁদেকানে আহ্বান জানিয়ে। উদ্দেশ্যও সেই সঙ্গে লেখা থাকে ঃ উভয়ের শক্তিতে মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা।

দেখতে দেখতে চাঁদেকানের জাহাজ-ঘাটায় এসে নোঙর করে কার্ভালোর তিনখানা বড় যুদ্ধজাহাজ, ছয়-খানা ছিপ, পঞ্চাশখানা জালিবোট আর একদল সাহসী সৈন্য।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রেরিত উপহার জরির

পোশাক ও একটি বহুমূল্য ঘোড়া কার্ভালোর আগমনকে জানায় সাদর অভিনন্দন। রাজপ্রতিনিধি প্রতিজ্ঞা করেন —তিন দিনের মধ্যেই মগরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য যা কিছু সমরোপকরণ দরকার, সে সমস্তই দেবেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য। অতএব তিনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

কিন্তু দেখতে দেখতে পনের দিন কেটে গেল। এর মধ্যে যুদ্ধযাত্রার সাজ-সরঞ্জামও যেমন এসে পৌঁছাল না, তেমনি দেখা মিলল না চাঁদেকানের রাজা প্রতাপাদিত্যের বা তাঁর প্রতিনিধির। শুধু দুই-একজন পর্তুগীজ পাদ্রীর গোপন হুঁশিয়ারি এসে পৌঁছাল ঃ কার্ভালো, বাঁচতে চাও তো পালাও—

কিন্তু কার্ভালো বীর। সাহসিকতাই তাঁর সহায়। তাই এ কথা শুনেও তিনি শুনলেন না, একটু হাসলেন শুধু!

সে হাসি উপেক্ষার।

এরই কয়েক দিন পরে সংবাদ এল। দূত এসে খবর দিলে—মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু আপনাকে দয়া করে রাজপ্রাসাদে যেতে হবে।

বেশ, তাই যাব।—কার্ভালো জানালেন। তাঁর মুখে উপেক্ষার হাসি। তিনি ভেবেছিলেন, এইভাবে নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ করে এনেও যে রাজা দেখা করতে ইতস্তত করেন, তাঁর মনে নিশ্চয়ই কোন দ্বিধা আছে। কিন্তু সে দ্বিধা তাঁর নিজের মনে নেই। সাহসই তাঁর একমাত্র পরিচয়পত্র। সে পত্র কোন দিনই তাঁর সম্বন্ধে অন্য কথা বলবে না!

তাই যথাসময়ে কার্ভালো চললেন রাজপ্রাসাদে। কিন্তু কয়েকটি দেউড়ি পার হবার পরই পথপ্রদর্শকের কৌশলে কার্ভালোর সঙ্গীরা পড়লো পেছনে, এগিয়ে গেলেন কার্ভালো, আর ঠিক সেই মুহূর্তে দুই দলের মাঝখানে নেমে এসে পথ বন্ধ করে দিলে একটা মোটা ইস্পাতের পর্দা!

এক মুহূর্তে কার্ভালো বুঝতে পারলেন নিজের অবস্থাটা। চীৎকার করে যেন শূন্য স্থানকে প্রশ্ন করলেন—আমি কি বন্দী?

কেউ কোন উত্তর দিল না। কেবল কোন্ অলক্ষ্য স্থান থেকে কানে এল এক সর্বনাশা অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ! খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনি শোনা গেল তার—যা কানে যেতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হতে চায়, অন্ধকার থেকে ডানা ঝট্‌পট্ করে ওঠে চামচিকা আর বাদুড়ের ঝাঁক।

এর পরের ইতিহাসে ডোমিনিক কার্ভালো সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু লেখা হয়েছে বলে জানা যায় নি। তবে খবর পাওয়া যায়—চাঁদেকান রাজ্যকে রক্ষার জন্য মগরাজার মনস্তুষ্টি করতে রাজা প্রতাপাদিত্য সেখানে উপহার পাঠিয়েছিলেন কার্ভালোর ছিন্নশির!

এ খবর জনশ্রুতি হওয়াও আশ্চর্য নয়।

রকম রকম জানবার কথা

বাদল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

সেলুলয়েডের তৈরী জিনিস দেখেনি—এমন লোক বোধ হয় নেই। 'সেলুলয়েড' পদার্থটি তৈরী হয়, উদ্ভিজ্জের মধ্যে 'সেলুলোজ' নামে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তা থেকে। সেলুলোজ কখনও জলে গলে না। গলাবার জন্য তাই সেলুলোজকে নাইট্রিক এ্যাসিডে গলিয়ে 'সেলুলোজ নাইট্রেট' নামে একটি আলাদা পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। পরে ওই সেলুলোজ নাইট্রেট-কে 'এ্যাসিটোন' এবং 'ইথার সালফিউরিক' দিয়ে গলিয়ে নরম করা হয়। এরপর ওই নরম জিনিসটিকে নানারকম ছাঁচে ফেলে নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈরী করা হয় এবং পরে ঐ নরম জিনিসপত্রগুলো শুকিয়ে এলে কঠিন 'সেলুলয়েডে' পরিণত হয়।

॥ দুই ॥

আজকাল আমরা প্রায় প্রতি ঘরেই 'চীনেমাটি'র জিনিস বলে কথিত কিছু না কিছু বাসনপত্র ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চীনেমাটি' বলে কোন জিনিস নেই। আসলে ওই সব বাসনপত্র তৈরী হয় 'Porcelain' নামক একপ্রকার গুঁড়ো পদার্থ থেকে। এই Porcelain-এর আবিষ্কার সর্বপ্রথম চীনদেশেই হয়। বেশ কিছুকাল অবধি একমাত্র চীনদেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ-ই এই Porcelain-এ জিনিসপত্র তৈরীর কৌশলটা জানত না। Porcelain তৈরী হয় প্রধানতঃ তিনটি পদার্থ মিলিয়ে ঃ 'কেওলিন' (এক রকম মিহি মাটি), 'ফেল্টস্পার' (পাথরের গুঁড়ো), 'কোয়ার্জ', আর সঙ্গে থাকে বালি।

কাঠবোলতার গল্প

সলিল মিত্র

তোমরা বোলতা দেখেছ। তার হুলের বিঁধুনিতে কতো যে জ্বালা, তাও বোধহয় টের পেয়েছ। কিন্তু কাঠ-বোলতা দেখেছ কোনদিন? একটু অবাক হচ্ছ বোধ হয়, —ভাবছ, কাঠবোলতা আবার কি? শোন, তবে বলি। কাঠবোলতাও বোলতার মত একরকমের প্রাণী, আর খুবই শক্তিশালী প্রাণী।

কয়েক বছর হল ডাঃ ইলিফ্রিঁজ এই কাঠবোলতা আবিষ্কার করেছেন। ডাঃ ইলিফ্রিঁজ হলেন একজন মহিলা বৈজ্ঞানিক, দেশ তাঁর পশ্চিম জার্মানীতে। তাঁর সন্ধানী চোখে কেমন করে এই আজব প্রাণীটি ধরা পড়ে, সে কথা বলা শক্ত!

এই কাঠবোলতার স্বভাবটি কিন্তু বড়ো আশ্চর্যের। কেমন স্বভাব জান? বড় বড় গাছের গুঁড়িকে ফুটো করে এরা তার ভেতরে চলে যায়, তারপর নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানেই ডিম পাড়ে।

তোমরা ভাবছ বোধহয়, গাছের গুঁড়ির ভেতরে আলো-বাতাস না পেয়ে ডিমগুলো নিশ্চয়ই শুকিয়ে মরে যাবে। কিন্তু তা মোটেই নয়। ডিমগুলো মরবে না, ওরা ঠিক বাচ্চা হয়ে একদিন পৃথিবীর আলোয় বেরিয়ে আসবেই। তবে এই বেরিয়ে আসা ওদের দু-পাঁচ দিন বা দু-এক মাসেও হয়ে ওঠে না। ডিম ফুটে পরিণত বাচ্চা হতে ওদের সময় লাগে প্রায় এক থেকে দু-টো বছর। তবে খুব সহজে বাচ্চারা গাছের গুঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, কাঠকে ফুটো করে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসতে ওদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। দিনের পর দিন অনেক চেষ্টা করে ওরা একদিন আলোর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে।

তোমরা বোধহয় ভাবতেই পারছ না, কি করে অতটুকু একটা প্রাণীর পক্ষে শক্ত কাঠকে ফুটো করে বেরিয়ে আসা সম্ভব। শক্ত কাঠকে ফুটো করা ওদের কাছে কিছুই নয়। কাঠ তো কাঠ, তার চেয়েও শক্ত জিনিসকে ওরা ফুটো করে ফেলতে পারে! এটা তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পার।

মনে করো, তোমাদের বাড়ির সামনের ঐ মোটা দেবদারু গাছটার গুঁড়িতে কাঠবোলতা এসে বাসা বেঁধেছে। ব্যাপারটা তুমি ঠিক সময়ে জানতে পেরে গেলে আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। সহজ-প্রাপ্য জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত হল ইস্পাত। তুমি বাজারে গিয়ে কিনে আনলে মোটা ইস্পাতের তৈরী শক্ত মজবুত চাদর একখানা। তারপর সেই ধাতুর তৈরী চাদর দিয়ে দেবদারু গাছের গুঁড়িটা তুমি ঢেকে দিলে। ব্যস্, তুমি এবার ভাবলে, খুব জব্দ হয়ে গেল কাঠবোলতাটা! ইস্পাত ফুটো করে বেরোয়, তার এমন সাধ্যি কোথায়? কিন্তু কদিন পরেই তুমি গাছটার তলায় গিয়ে একেবারে অবাক। এ কি! ইস্পাতের শক্ত মজবুত চাদরটার এক জায়গায় ফুটো মতো দেখা যাচ্ছে যে! তা হলে কি কাঠ-বোলতাটা ইস্পাতকেও ফুটো করে বেরিয়ে গেল? হ্যাঁ, তাই গেল। আর পরীক্ষা করে তোমারও দেখা হল যে, কাঠবোলতা নামে ঐ ক্ষুদে পতঙ্গটি ইস্পাতের মত শক্ত ধাতুকেও অনায়াসে ফুটো করে ফেলতে পারে।

শুধু এই-ই নয়, আরো আছে। বলি শোন,—

তোমার পড়ার ঘরে দামী শক্ত কাঠের তৈরী সুন্দর যে টেবিলটা আছে, যার উপর বই-পত্তর নিয়ে তুমি ইস্কুলের পড়াশোনা করছ—সেই সুন্দর মজবুত টেবিল-টার কোন এক জায়গা একদিন তুমি ফুটো হয়ে গেছে দেখতে পারো। বই-পত্তরগুলো গুছোতে গিয়ে সত্যিই হয়তো একদিন দেখলে, কে যেন সুন্দর টেবিলটাকে ফুটো করে রেখে গেছে। দেখে তো তোমার চোখ ছানাবড়া, দুঃখও তেমনি! কিন্তু কেউ তো তোমার পড়ার ঘরে ঢোকে না। কে তাহলে সেই হতভাগা, যে ফুটো করে রেখে গেল তোমার সৌখিন টেবিলটা? খোঁজ খবর করে শেষকালে তুমি জানতে পারলে, এ-ও ওই কাঠবোলতার কাজ! কে জানে, কবে ঐ কাঠের মধ্যেই কাঠবোলতা ডিম পেড়ে রেখে গিয়েছিল, আর সেই কাঠ দিয়েই তৈরী হয়েছিল তোমার ঐ টেবিলখানা। এতদিনে সেই ডিম ফুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বাচ্চাটা—তোমার টেবিলটাকে ফুটো করে।

তাহলে বুঝতে পারছ, শক্ত ধাতুর পদার্থকেও যারা অনায়াসে ফুটো করে ফেলতে পারে, তাদের শক্তি কতখানি! অথচ ওরা তো সামান্য একটা পতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

লেণ্ঠন ও ঘুটঘুটি
রেখায় ও লেখায় ঃ সূর্য রায়
১
ঢং ঢং ঢং-ঢং-ঢং-ঢং
ইস্কুল শুরুর ঘণ্টা বাজায় রামচরণ
২
গাছের ডাল থেকে নেমে এক দৌড়ে ক্লাসে
৩
'অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে' —অর্থ বল সুধীর
৪
অনর্থ প্রথমেই..
ঘুটঘুট্টি রাতে যেমন...
ঘুটঘুট্টি—
এই ঘুটঘুট্টি—
ঘুট্টি...
৫
অঙ্ক-স্যার আরও ভয়ঙ্কর ; মানসাঙ্ক
বল সুধীর, শতকরা তিরাশি টাকা সুদে তিনশত—
সুদ নেওয়া পাপ স্যার !
ঘুটঘুট্টি গাঁট্টা খাবি !
৬
পরীক্ষায় কিন্তু প্রথম পাঁচ জনের মধ্যেই থাকে সুধীর।

বাকী চার জনের আলোচনাটা তাই নিয়েই...
৭
রোজ রাতে ও কোথায় যায় বল্ ত ?
পড়তে নিশ্চয়ই
পড়তে ?
কোথায় ?
সত্যিই বই আর লণ্ঠন-হাতে
কোথায় যেন
যাচ্ছে 'ঘুটঘুট্টি' সুধীর
৮
চুপ !
পেছনে
পেছনে
চল্ !
কোথায় চলল রে
শহর ছাড়িয়ে ?
ঐ সেই
মড়াকাটা ঘর !
রাম রাম
ভূত আমার পুত...
৯
সর্বনাশ ! ঐ ঘরটার পাশ দিয়েই-
পেত্নী
আমার ঝি,
ভূত আমার...
১০
সুধীর !
মেথর পাড়ায় আলো নিয়ে
আর কে আইস্‌বে রে !
১১
দুতিনটি ছাত্র : মাইনে দিতে হয় না।
মাস্টার সুধীর : মাইনে নিতে হয় না।
১২
একটি লণ্ঠন
: অজ্ঞানের ঘুটঘুট্টি
অন্ধকারে...

[চলবে]

দুরন্ত ঈগল

দীননাথ কাশ্যপ

ধারাবাহিক উপন্যাস

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

প্রথম খণ্ড ॥ প্রথম পর্ব

॥ ছয় ॥

হিমানী-সম্প্রপাতের গর্জন থামতেই বরফ-মুকুটের তলাকার পাহাড়টার ওপর যে তুষারের গাদা জমেছিল, সেটা নড়ে উঠলো। পরক্ষণে ইভাস্কো বেরিয়ে এল তার নীচে থেকে।

পাশের তুষারের গাদায় ঠেলা মেরে সে হাঁক ছাড়লে, —ওঠ হে, যাওয়া যাক!

মুসা বেরিয়ে এল। গা ঝাড়তে ঝাড়তে চোখের ওপর থেকে তুষার সরিয়ে সে বললে,—তারপর?

ইভাস্কো বললে,—মূল হিমানী-সম্প্রপাত যেখানে ঘটেছে, আগে সেখানেই যাওয়া যাক, কি বলো?

হিমবাহ থেকে যে বিপুল তুষার নেমেছিল, ইতিমধ্যে তা বিরাট বিরাট বরফের চাংড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢিবির আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে স্তূপাকার হয়ে।

ঢিবিগুলোর ভেতর দিয়ে তারা এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা কুকুরের কেঁউ-কেঁউ ডাক কানে এল। এক ঢিবির ওদিকে কুকুরটা বসে আছে। তার গায়ের লোম লাল, মাঝে মাঝে সাদা সাদা ছিট। গলার দড়ি ভারী এক বরফের চাংড়ার নীচে আটকে গেছে। মুসা তার গলা-বন্ধ কেটে দিতেই কুকুরটা একলাফে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল—অথচ একটু আগেও ওদের উপর তার হাম্বি-তম্বির অন্ত ছিল না।

যেদিকে তাকানো যায়, শুধু বরফ—নিস্তব্ধ প্রাণ-হীন। হিমকণার মেঘ পরদার মতো বাতাসে ঝুলছে, দূরে নজর যায় না। ইভাস্কো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে: যাক্, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, হিমানী-সম্প্রপাতেই খতম হয়েছে বাসমাচিরা।

তারা ফিরে এল ইয়াক দুটোর কাছে। স্থির করলো, তরুণ শিকারীটি যেদিকে গেছে, সেদিকেই যাবে।

অবসন্ন ইয়াক দুটো থেকে থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ছাড়ছে নাক দিয়ে। দুই চোখ রক্তলাল।

পুরু তুষারের ওপর কোন পথ নেই। জানোয়ার দুটো সহজাত সংস্কারের বলে পথ করে নিয়ে চোখ পাকাতে পাকাতে সোজা এগিয়ে চললো।

বাসমাচিরা মারা পড়েছে ধারণা হতেই, নিদারুণ অবসাদ এসে ইভাস্কোকে যেন চেপে ধরেছে। অজানা

পর্বত-এলাকার আকস্মিক বিপদ-আপদ সম্বন্ধেও সে যেন উদাসীন।

বাসমাচি কুকুরটা হঠাৎ ডেকে উঠলো। কাছাকাছি কোথাও সে বোধহয় জীবন্ত কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়েছে। ইয়াক দুটোও বাঁক নিয়ে আরো জোরে ছুটতে শুরু করে।

দূরে তুষারের ওপর একটা কালো বিন্দু নড়ছে মনে হলো।

ভল্লুক!—শুকনো গলায় মুসা বললে।

ক্লান্ত অবশ হাতে তারা রাইফেল টেনে নিলে। কিন্তু কিছুটা যেতেই চমকে উঠলো ঃ কয়েকটা ছোট ছোট কুঠি! তাদের ছাদ দেখা যাচ্ছে!

স্তব্ধ বিস্ময়ে ওরা তাকায় পরস্পরের দিকে। এত উঁচুতে দুর্লঙ্ঘ্য এই পর্বত-রাজ্যের সুদূর নিভৃত কোণে কোথা থেকে এল এই নিঃসঙ্গ গ্রাম! মানুষ বাস করে নিশ্চয়ই। দূর থেকে গাঁয়ের ধোঁয়াকেই তারা কালো বিন্দু বলে মনে করেছিল।

পরনের ট্রাউজার তুষারে জমে জিনের সঙ্গে সেঁটে গেছে। অতি কষ্টে ট্রাউজার ছাড়িয়ে তারা নেমে পড়লো। ইয়াক দুটোও সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লো বিশ্রামের জন্যে।

পা দুটো অবশ। এখন কি করণীয়? চোখের ইশারায় নিঃশব্দে কর্তব্য স্থির করে হোঁচট খেতে খেতে তারা কোন রকমে একটা কুঁড়ের ছাদে গিয়ে উঠলো, ছিদ্রপথে তাকালো ভেতরের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই হটে এল—বিজাতীয় উৎকট দুর্গন্ধে দম আটকে আসে!

ওরা হকচকিয়ে যায়। মুসা ফিস ফিস করে বললে,—গুলজান!

অনেকগুলো কুকুরের মিলিত চিৎকার কানে আসছে। অজানা দেশ। কুঁড়ে ঘরগুলো কাদের জানা নেই। হতভাগ্য বাসমাচিরা হয়তো এখানে থাকতো। কিংবা অসভ্য বর্বরদের আস্তানাও হতে পারে। আজ রাতে তাদের হাতেই হয়তো প্রাণ যাবে।

কিন্তু পেছোবারও তো পথ নেই। কোথায় যাবে? হয় নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে ফিরে যেতে হবে, সেখানে আছে তুষার, বরফ, হিমশীতল ঠাণ্ডা আর অনাহার, আর নয়তো কুঁড়েয় ঢুকতে হবে। তারা তাকায় চার-দিকে। হিমাচ্ছন্ন নীল রাত্রির আকাশে বাতাসে অজানা বিপদ আর মৃত্যু যেন ওত পেতে আছে।

শেষ পর্যন্ত ইয়াকের লেজের লোমে তৈরী দড়ির একটা মই বেয়ে ইভাস্কো কামরার মধ্যে নামতে শুরু করে। ভেতরটা বেশ গরম।

এই, কে আছ ভেতরে?—সে হাঁক ছাড়লে।

জবাবে ফিরে এল ক্ষিপ্ত একপাল কুকুরের মিলিত চিৎকার। কুকুরগুলো মইয়ের তলায় এসে জড়ো হয়েছে। তীক্ষ্ণ শব্দ উঠছে তাদের দাঁতে দাঁত লেগে। শরীরের ভেতরকার পাঁজরাগুলো দেখাচ্ছে বাঁকা ধনুকের মতো। চাপবাঁধা গায়ের লোম চকচক করছে মরা জোছনায়।

মইয়ের ওপর দোল খেতে খেতে রিভলবার উঁচিয়ে ইভাস্কো আবার চেঁচিয়ে উঠলো,—এ-ই! কে আছ এখানে?

কিন্তু ক্ষুধার্ত কুকুরদের উন্মত্ত চিৎকারে তার কণ্ঠ-স্বর ডুবে গেল। সযত্নলালিত সুপুষ্ট এক অপরিচিত কুকুর বাইরে উপস্থিত টের পেয়ে, ওরা যেন রাগে ক্ষেপে উঠেছে।

নিরুপায় অবস্থা। ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে ইভাস্কো রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করলে। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। সেই ফাঁকে মুসা কামরার বাসিন্দা-দের উদ্দেশে কিরঘিজ ভাষায় কথা বলতে শুরু করে।

একটু পরেই কামরার ভেতরকার চুল্লির আগুন জোরে জ্বলে উঠলো। কে একজন তাড়িয়ে দিলে কুকুরগুলোকে। রিভলবার হাতে মেঝেতে লাফিয়ে পড়েই ইভাস্কো একটা গ্রেনেড টেনে বের করলে। পেছনে পেছনে মুসা নেমে এল কুকুরটাকে নিয়ে। ইভাস্কোর হাত চেপে ধরে বললে,—ঘাবড়াও মাৎ! হাতিয়ার সব সরিয়ে নাও। বাসমাচিরাও যদি এখানে থাকে, নিজের আস্তানায় তারা আমাদের গায়ে হাত তুলবে না। এটা মুসলমানী আইন—শরীয়তের নির্দেশ।

অন্ধকারের ভেতর থেকে বাসিন্দারা সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। চুল্লিতে আগুনের শিখা বাতাসে কাঁপছে। ঘরের ঝুলকালিভরা নোংরা থামগুলোর গায়ে দেখা যায় আলো-ছায়ার খেলা—নানা ছবির আনাগোনা।

গাঁয়ের প্রতিটি বাসিন্দার বুকে ভূতপ্রেত তাড়ানোর তাবিজ। জুরার মা আয়েশা বুড়ি মন্ত্র আওড়াচ্ছে ফিস ফিস করে। আগন্তুকদের দুর্বোধ্য কথাবার্তা তার কানে ঠেকছে জাদুমন্ত্রের মতো। ওরা কারা কে জানে! হয়তো সত্যিকারের মানুষই নয়, হয়তো জিন বা খবিশ!

ইভাস্কো শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে, যে থামে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঁপছে সেটাও। মুসার কথা বা শরীয়তী আইনের ওপর তার আস্থা নেই। রিভল-

বার চেপে ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। লোকগুলো অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে তাকে দারুণ উত্তেজিত করে তুলছে।

সাহসে ভর করে পায়ে পায়ে আয়েশা বুড়ি এগিয়ে আসে। প্রতি পদক্ষেপে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে আগন্তুকদের। কামরার ভেতর ক্রমেই বাড়ছে গোলমাল। ইভাস্কোর আর সহ্য হলো না। হঠাৎ চুল্লি টপকে অন্ধকারের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে সে রুক্ষ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো,—একশো শয়তানকেও আমি পরোয়া করি নে! মাতব্বর কোথায়? এগিয়ে আসুক!

কিরঘিজ ভাষায় শোনা গেল মুসার কণ্ঠ,—খবরদার! কেউ বেরোবে না! নড়বেও না!

বাসিন্দারা ভয়ে বেসামাল। কী সর্বনাশ! চুল্লি টপকে কাফেরটা আগুন অশুদ্ধ করলো! তারা হাউমাউ করে উঠলো,—সর্দার, সর্দার, জলদি আসুন, জলদি আসুন! বাঁচান আমাদের! শীগ্‌গীর, সর্দার, শীগ্‌গীর!

হৈ-হল্লার মধ্যে মুসা চকিতে এক ফাঁকে কুঁজো হয়ে খানকয়েক জ্বালানি ছুড়ে দিলে চুল্লিতে। জোরে আগুন জ্বলে উঠতেই ভয়ে পিছিয়ে গেল বাসিন্দারা। পেছনে পড়ে রইল একটা বাচ্চা মেয়ে। ভয়ে সে কাঁদতে শুরু করে।

ভাপে সেদ্ধ হবার মতো গরম কুঠরির মধ্যে। পার্টিজানদের কাপড়চোপড়ের তুষার গলতে শুরু করেছে। সশব্দে মেঝেয় পড়ছে তুষারের খণ্ডগুলো।

দেওয়ালের গায়ে এক অন্ধকার ফোঁকর দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই সেখান দিয়ে ঘরে ঢুকলো বৃদ্ধ সর্দার ইস্কান্দার। মোটা হাঁসের মতো হেলে দুলে হাঁসফাঁস করতে করতে এক পা এক পা করে সর্দার এগিয়ে আসে আগুনের দিকে। তার গায়ে সোনালী রঙের ড্রাগন-আঁকা নীল রেশমের একটা পুরনো চীনা কোট। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এই ধরনের জমকালো পোষাকই পরে সর্দার।

বাচ্চা মেয়েটার কান্না থেমে গিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত বিচিত্র সাজসজ্জায় প্রপিতামহকে চিনতে না পেরে আবার সে কান্না জুড়ে দিলে।

আত্মরক্ষার তাগিদে ইভাস্কো ইতিমধ্যে আবার রিভলবার তুলে নিয়েছে। ওটা সে তাক করলো বুড়োর দিকে।

ধীর পদক্ষেপে সর্দার এগিয়ে আসছে। ভেতরের ভয় বাইরে গোপন করতে সে সচেষ্ট। মনে মনে আকুল হয়ে সে কুলদেবতাকে ডাকছে,—হে আর্বাখি, আমায় রক্ষা করো! হাত ধরে নিয়ে চলো দেবতা!

সর্দারের পেছনে আসছে জুরা ও কুচাক। জুরা তার বাঁ কনুই ধরে আছে, কুচাক ধরে আছে ডান কনুই। সর্দারকে তারা আগুনের ধারে এনে সন্তর্পণে বসিয়ে দিলে।

সর্দার কাতরাচ্ছে—আগন্তুকদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে দুর্বল ও অসহায়ের ভান করছে সে।

কপালের ঘাম মুছে ইভাস্কো চুল্লির পাশে বসে পড়লো।

ক্ষীণ কণ্ঠে সর্দার বললে,—মুসাফিরদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হোক।

কুচাক ডাকলে,—জয়নাব!

ত্বরিতপদে ঘরে ঢুকলো বছর ষোল বয়সের এক সুশ্রী তরুণী। লোহার তিনটে লম্বা চায়ের কেটলি নিয়ে সে আগুনের ওপর বসিয়ে দিলে।

মুসা ঢুলতে শুরু করেছে। তাকে আস্তে ঠেলা মেরে ইভাস্কো বললে,—জিজ্ঞেস করো, ওরা কারা।

চা পান শেষ না করে জিজ্ঞাসাবাদ করা বেআদবি। —ঢুলতে ঢুলতেই মুসা জবাব দেয়।

নিস্তব্ধ ঘর। কেটলিতে জল ফুটছে। জয়নাব চীনামাটির কয়েকটা কাপ এনে গরম জলে ধুয়ে আল-গোছে সর্দারের সামনে রাখলো। সর্দার নিজের লম্বা রেশমী কোমরবন্ধ খুলে ফেলে। কোমরবন্ধের ভাঁজ থেকে এক-এক টিপ চা নিয়ে ফেলে দেয় কাপের মধ্যে।

জুরার মা আয়েশা বুড়ি ঘরে ঢুকলো। লাল-পাথরের ভারী একটা কাপ তার হাতে। কাপটার ধার বেশ মোটা। কাপটা ধুয়ে সর্দার কয়েক ফোঁটা চা ঢেলে দেয় তার মধ্যে। কাপের তলাটা ভরতেই সেটা এগিয়ে দেয় ইভাস্কোর দিকে।

বিরক্তিতে ইভাস্কো গজগজ করে উঠলো,—অ্যাঁ, ব্যাপার কি? এতটুকু চা কেন? কাপের তলাটাও ভিজেছে কিনা সন্দেহ। ভরতি করে দিতে বলো, মুসা। পুরো কাপ না হলে...

মুসা বাধা দেয়,—নিয়ে নাও, নিয়ে নাও! চা যত কম হবে, সম্মানের বহর বুঝবে ততই বেশী।

চা খাওয়া শেষ করে ইভাস্কো আলোচনা শুরু করে। জিভ এত ফুলে গেছে যে, কথা বলা কষ্ট। ইভাস্কো আর সর্দারের মধ্যে দোভাষীর কাজ করে মুসা।

ভ্রূ কুঁচকে সর্দার বললে,—সৈনিক বাহাদুর যে ভাবে হাতিয়ার তাক করে আছেন, তাতে সর্দারের অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক।

তারা রিভলবার সরিয়ে নেয়। উৎকট ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ঘর ভরতি। চোখে জল এসে যায়। তারা হাঁচতে শুরু করে।

একে একে গাঁয়ের বাসিন্দারা এসে সব জড়ো হচ্ছে। পশুর চামড়া গায়ে চারপাশের দেয়াল ঘিরে মেঝেতে বসেছে তারা। তাজিক জাতের মানুষ তাদের চোখে এই প্রথম। কৌতূহলী উদ্‌গ্রীব চোখে তারা তাকিয়ে আছে।

দেয়ালের বাইরে থেকে ইয়াকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ কানে এল। ইভাস্কো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে—যাক্‌ গৃহপালিত জানোয়ার তাহলে আছে কিছু। অর্থাৎ গুলজান খেতে হলেও গাঁয়ে এখনো চূড়ান্ত আকাল দেখা দেয় নি।

ইতিমধ্যে চা-পান শেষ হয়েছে, ওদের দুজনের কিছু খাওয়া দরকার। পেটের মধ্যে যেন খাণ্ডবদাহন চলেছে। ব্যাগের ভেতরকার চিনি, মাংস, পাঁউরুটি সব ঠাণ্ডায় জমে দলা পাকিয়ে গেছে। ছোরাগুলো পর্যন্ত এমন এঁটে গেছে যে, খাপ থেকে বেরোতে চায় না।

আগুনে সেঁকে ছোরাগুলো তারা বের করলো খাপ থেকে। হাতখানেক করে লম্বা সেগুলো। জমে-যাওয়া পাঁউরুটিগুলো কেটে তারা অর্ধেক দিলে সর্দারকে।

ইভাস্কো গাঁ সম্পর্কে সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জানতে চায়, গাঁয়ে বাসিন্দা কত জন? ক জন পুরুষ?

কথায় কথায় জানা গেল, সারা গাঁয়ে বন্দুক মাত্র একটা—একটাই মাত্র ম্যাচলক গাদাবন্দুক সম্বল।

ওদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সর্দার কোন কিছু জানাতে নারাজ। যেটুকু না বললে নয়, সেইটুকুই সে শুধু বলছে,—তাও ক্ষীণকণ্ঠে।

মুসা মারফৎ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে ইভাস্কো।

শেষ পর্যন্ত সর্দার বলে,—অনেক কাল আগের কথা, সুদূর অতীত যুগের কাহিনী.....সারসেরা তখন ফৌজের নেতৃত্ব করতো, আর ধড়িবাজ শেয়াল সিংহের মন পাওয়ার জন্যে বনের জানোয়ারদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করতো...

ইভাস্কো ও মুসার মনে হয়, রূপকথা বলে বুড়ো এক অলৌকিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইছে।

থেমে থেমে বুড়ো কথা বলছে। সে বলে চলে নিজেদের গোষ্ঠীর পুরনো গরিমা আর শৌর্যবীর্যের কথা—সেই সে কালের কথা, তখন তার কিরঘিজ পূর্ব-পুরুষেরা ইয়েনেসী নদীর উপর অংশ থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুবিশাল ভূখণ্ড দখল করেছিল।

কিভাবে গাঁয়ের জীবনযাত্রা চলে, তাও সে জানায় কিছুটা। বলে, সারা গাঁয়ের লোক একই পরিবারের মতো বাস করে, একসঙ্গে পশু চরায়, মিলেমিশে শিকার করে। তারা কোথাও যায় না, তাদের কাছেও কেউ আসে না...

বলতে বলতে বুড়োর গলা ধরে এল, শেষে বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে বললে,—কিন্তু আজ অবস্থা বড়ই কাহিল। আমরা উপোস করছি, গুলজান খেয়ে টিঁকে আছি। গত হেমন্তে বুনো ছাগল-ভেড়ার পাল কোথায় যে উধাও হয়েছে, কে জানে! পোষা জানোয়ারগুলোকে খেয়ে শেষ করেছি। বাচ্চা দেবার জন্যে গাঁয়ের এখন শেষ সম্বল একটা করে মদ্দা ও মাদী ইয়াক আর একটা করে ছাগ ও ছাগী।

ইভাস্কো হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বললে,—কামরাগুলো একবার দেখতে চাই।

বিড় বিড় করে সর্দার বললে,—দেখিয়ে আন।

বড় একটা বাতি নিয়ে কুচাক আগে আগে চললো। বাতিতে পেট্রল জ্বলছে। জুরাও সঙ্গে যায়।

কুঠরি মোট পাঁচটা। একই দৃশ্য সব কটিতে। নিরাভরণ নোংরা দেয়াল। আসবাব বলতে মেঝেতে খানকয়েক চামড়া ও বালিশ, একটা করে কেটলি আর কয়েকটা কাপ,—ব্যস্‌।

কিন্তু হঠাৎ—ও কী! কুঠরির এক অন্ধকার কোণে আয়েশা বুড়ি চটপট কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছে না!

কোন অস্ত্রশস্ত্র নয় তো! ইভাস্কোর সন্দেহ হয়। সে ছুটে গেল আয়েশার দিকে। বুড়ি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো একটা বাণ্ডিল বুকে চেপে ধরে।

জুরা ধমকে উঠলো,—কি আছে, দেখাও!

বাণ্ডিলের ভেতর থেকে বেরোলো শুধু ন্যাকড়া—ছেঁড়া কাপড়-চোপড়।

ইভাস্কো অবাক, মুসাকে জিজ্ঞেস করে,—এগুলো ও লুকোচ্ছিল কেন?

—আমাদের ওরা চোর-ডাকাত ধরে নিয়েছে।

তুষার-ঢিবির ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে কুঠরি থেকে কুঠরিতে যাতায়াতের পথ। ইভাস্কোর খনির কথা মনে পড়ে। একমাত্র সর্দারের কুঠরি ছাড়া সর্বত্র অনাহার ও চরম অভাবের দৃশ্য।

তল্লাসি সেরে আবার তারা সর্দারের কামরায় ফিরে এল। বাসমাচি বা হাতিয়ারপত্র কোথাও কিছু নেই—সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিন্ত।

চুল্লিতে সশব্দে কাঠ পুড়ছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে। বুড়ো ইস্কান্দারের গোঙানি ও কাতরানির যেন বিরাম নেই। কাতরাতে কাতরাতে মাঝে মাঝে সে ইভাস্কোর হাঁটুর ওপর থেকে ফুলকির ঝুলকালি সাফ করে দিচ্ছে। মেজমানদের খিদমতের জন্যে সে কিরকম তৎপর, সেটাই বোধহয় দেখাতে চায়।

মুসার পাশে জুরা বসে আছে। আদরের টোকা মারছে মুসার রাইফেলের কুঁদোয়। মনে মনে তার সিদ্ধান্ত স্থির, রাতে লোক দুটোকে খুন করে রাইফেল দুটো সে হস্তগত করবে।

ইভাস্কো হঠাৎ জুরাকে জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, এ অঞ্চলে কোন হ্রদ আছে?

জুরা ঘাড় নাড়ে,—হ্যাঁ, আছে। বড় বড় কয়েকটা। এত বড় যে, এপার থেকে ওপার প্রায় দেখাই যায় না।

—কোন রাস্তাঘাট?

—আছে কিছু কিছু, কিন্তু সবার জন্যে নয়। পর্বতে পর্বতে বরফের পর বরফ-এলাকা যারা কিভাবে পার হতে হয় জানে, যারা বুনো পাহাড়ী ছাগল-ভেড়ার টাটকা রক্ত খায়, আর পাতাল-ছোঁয়া খাদ আর গহ্বর পার হবার সময় পর্বতের দেবতারা যাদের রক্ষা করেন, সেসব পথে তারাই শুধু চলতে পারে।

ইভাস্কো মুখের উপর দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে আবার প্রশ্ন করলে,—নদীটদি কিছু আছে?

হ্যাঁ, আছে। অনেক।—সরল কণ্ঠে জুরা জবাব দেয়,—যেমন ধরো দুর্দান্ত সৌকসাই নদী। পাহাড়ে পর্বতে আমি অনেক ঘুরেছি, অনেক জামাকাপড় ছিঁড়েছি, গেছিও সর্বত্র। কিন্তু সৌকসাইয়ের উজানে, তার উৎসের কাছে কখনো যেতে পারি নি। কেউই পারে না। দেবতাদের বাস সেখানে, আর ড্রাগনে ভরতি। কেউ গেলে, তার কপালে জোটে ভয়ংকর মৃত্যু।

হা-হা করে ইভাস্কো এবার হেসে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণে ককিয়ে উঠলো যন্ত্রণায়। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে।

জুরা হকচকিয়ে যায়। কি! আগন্তুকরা হাসছে! কেন? ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে হিমশীতল কণ্ঠে সে বললে,—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ তো, সর্দার তো ভূয়োদর্শী, তাঁকেই ওরা জিজ্ঞেস করুক না!

সে কথা বন্ধ করলো। তার কালো মোটা ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেছে। চোখ ছোট করে কঠিন নির্বাক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে ব্যঙ্গকারী আগন্তুকদের দিকে।

ইভাস্কো ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে, তাদের পরিচয় ও এখানে আসার উদ্দেশ্য ওদের কাছে খুলে বলতে হবে। মুসাও সায় দেয়।

ইভাস্কোর কথা সে তর্জমা করে চলে,—শুনুন, সর্দার, আমরা বাসমাচি নই, আমরা পার্টিজান। তাগাই আর তার দলের পেছু নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা বুলেটও আমাদের খরচ করতে হয় নি। হিমানী-সম্প্রপাতে তারা সবাই খতম হয়েছে।

কথাটা জুরার মাথায় ঢোকে না। কারণ যার বন্দুক আছে, সে হয় শিকারী, নয়তো লুঠেরা বাসমাচি। এ লোকগুলোও নির্ঘাৎ বাসমাচি, অন্য ডাকাতদের পেছু নিয়েছিল। পয়লা দল লুটপাট করেছে, আর এরা সেই লুঠের মাল নিয়ে সরে পড়ার ফিকিরে আছে।

ইভাস্কো বলে চলে,—আমরা বলশেভিক। সবার অবস্থা যাতে সমান হয়, তাই বড়লোকদের ধনদৌলত কেড়ে নিয়ে আমরা গরীবদের মাঝে বেঁটে দেই।

জুরা টিপ্পনী কাটলে,—তা বটে! কিন্তু মেহ্মান-দের গায়ে আরমিন বা শেয়ালের চামড়ার বদলে সস্তা ভেড়ার চামড়ার জামা কেন? গরীবদের জন্যে তো দূরস্থান, নিজেদের জন্যেও যারা ভাল জামাকাপড় জোগাড় করতে পারে না, যোদ্ধা হিসেবে তারা নিশ্চয়ই নীচু জাতের।

এসব কথায় কাজ হবে না, মুসা বুঝতে পারছে। তাই ইভাস্কোর কথায় কান না দিয়ে এবার সে নিজেই শুরু করলে, জুরাকে উদ্দেশ্য করে বললে,—ব্যাপার কি জান? আমাদের সবই আছে, যা তুমি চাইবে। চাকা-আলা লোহার কামরায় আমরা চলাফেরা করি।.....অ্যাঁ, চাকা কি জান না?

মুসা বিস্ময়ে ফেটে পড়ে,—চাকা হলো গিয়ে একটা গোল জিনিস, গড়িয়ে চলে।.....অ্যাঁ, কি হলো? বুঝতে পারছো না?

চায়ের কাপ নিয়ে সে টেবিলের ওপর গড়িয়ে দেখায়। ব্যাখ্যা করে বলে,—এটা হলো গিয়ে একটা লোহার ঘর, ঘোড়ার চেয়ে পাঁচগুণ জোরে ছোটে।

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। খুকখুক করে সবাই হাসছে।

সেদিকে আমল না দিয়ে মুসা বলে চলে,—এছাড়া আমাদের আর একটা জিনিস আছে, তাকে বলে সিনেমা। রাতের বেলায় প্রকাণ্ড এক ঘরে ঢুকতে হয়, এর চেয়ে সেটা একশো গুণ বড়।

কুচাক মন্তব্য করে,—বড়লোক খাঁ-এর কুঠি!

হাঁ, হাঁ,—অকূলে পাথারে মুসা যেন ডাঙা দেখতে পায়,—ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, খাঁ-এর কুঠি। তবে কিনা খাঁ-দের সব কুঠিই আমরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছি। সে যাই হোক, সেই ঘরে ঢুকলে দেখবে, চারদিকে সব বলশেভিক বাতি জ্বলছে আর সামনে দেখবে একটা সাদা দেয়াল। বাতিগুলোর ভেতরকার আগুন কিন্তু ঠাণ্ডা, তেমনি সাদাও বটে। বাতি নেবানোর সময় তোমায় ফুঁ দিতে হবে না, দেয়ালে একটা বোতাম টিপলেই হলো।

মেয়েরা আবার হাসতে শুরু করে।

মুসা বলে চলে,—বাতি নিবতেই সেই সাদা দেয়ালে দেখতে পাবে এক আজব দৃশ্য। দেখবে, জ্যান্ত মানুষের আত্মারা সব দৌড়চ্ছে, চলাফেরা করছে, গুলি ছুড়ছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘোড়ার পিঠে ছুটছে, খুনোখুনি করছে।

বুড়িরা ভয়ে হাউমাউ করে উঠলো,—সব্বোনাশ! কি কাণ্ড! লোকটা নিশ্চয়ই জাদু জানে। ভূতপেত্নী আর মরা মানুষের আত্মা ডেকে আনতে পারে!

জুরা রাগে ফুঁসছে। ভ্রু কুঁচকে সে তাকিয়ে আছে পার্টিজানদের দিকে। ওদের ওপর তার ঘেন্না ধরে গেছে। খাঁটি মরদ কখনো এরকম আবোলতাবোল বকতে পারে? এসব আষাঢ়ে রূপকথা শুধু মেয়েদের কাছেই চলে।

সর্দার কিন্তু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে। গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে গাঁয়ের মানুষ যেভাবে পার্টিজানদের কথা শুনছে, তাতে খুশী হওয়া চলে না। বিশেষ করে একটা কথা ভেবে সে খুবই উদ্বেগ বোধ করছে। মুসাফিররা যে দেশ থেকে এসেছে, মিন-আরখারের চেয়ে সে দেশ যদি বাসিন্দাদের কাছে ভাল লাগে, তাহলে কি হবে? তাহলেই গুরুতর বিপদ!

সুতরাং ধূর্ত বুড়ো হঠাৎ নির্বিকার-উদাসীনের ভান করে মাথা নাড়তে শুরু করলো। ভাবখানা যেন, এ সবই সে জানে। অথচ জীবনে আজ এই প্রথম সে অনেক নতুন নতুন কথা শুনলো, যদিও তার একবর্ণও বিশ্বাস করে নি। মুসার কথার মাঝখানে এক সময় মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলে উঠলো,—জানি, জানি, এ সবই আমাদের জানা। তাজ্জব হবার মতো কিছু নেই।

মুসা চটে গেল। বললে,—তাই নাকি? সর্দার দেখছি সবজান্তা। বেশ, তাহলে তিনিই বলুন, আমরা শুনি।

নিস্তব্ধ ঘর। অধীর আগ্রহে সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে। ঘোড়ার লোম আর রেশমের ফিতে দিয়ে সর্দারের ঝুলে-পড়া থুতনিটা বাঁধা। ধীরে ধীরে শুরু করে সর্দার,—হাঁ, ভূয়োদর্শী সর্দার সবই জানে। সে জানে, ককেসাসের পোষ-মানা দুরন্ত ঘোড়া আর্গামাক যখন হা-হুতাশ করে, তখন বুঝতে হবে, দলের আর সব সাথীদের জন্যই তার মন পুড়ছে। শুভ্র তুষার ঢাকা পর্বতমালার নীচে এক কালে সে কিভাবে সাথীদের সঙ্গে খুশী মনে ছুটোছুটি করে বেড়াত, তারই স্বপ্ন দেখে আর্গামাক। ঠিক তেমনি এমন একজন নির্ভীক তরুণ পাবে না, যে তার সোনার জন্মভূমির স্বপ্ন দেখে না। সাধের জন্মভূমি তার কাছে মক্কার মতোই পবিত্র। কে না জানে যে, বন্দী শ্বেত ঈগলের প্রাণ কাঁদে তার পুরনো সঙ্গীদের জন্যে, সেই পুরনো দিনের জন্য—যখন নির্মেঘ আশমানের দূর নীলিমায় সে পাখা মেলতো? এমন কে আছে, নিজের লোকদের নিরাপত্তার জন্যে যে ব্যাকুল নয়? কোথায় আছে সে পাখি, নিজের বাসা রক্ষার জন্যে যে ছটফট করে না?

এমনি করে বুড়ো বলে চলে। বলতে থাকে এক রহস্যময় অজ্ঞাত দেশের কাহিনী, ইভাস্কো ও মুসার কাছে যা শোনায় রূপকথার মতো।

নিবন্ত বাতিতে আয়েশা বার পাঁচেক তেল দিয়ে গেছে। সর্দারের বলার বিরাম নেই। চামড়ার কোট গায়ে জড়িয়ে বাসিন্দারা হাঁ করে শুনছে তার কথা। শুনতে শুনতে তাদের মনে হয়, মেহ্মানদের সারগর্ভ কথাগুলোই যেন বেরিয়ে আসছে সর্দারের মুখ থেকে। আর তার ফলে সর্দার যা চেয়েছিল, তার ঠিক উল্টো ক্রিয়া ঘটতে থাকে তাদের মনের ওপর। জুরার মনেও প্রশ্নের ঝড়ঃ আগন্তুকরা তাহলে যে কাহিনী বলছিল, তা রূপকথা নয়! বুড়োর অনেক কথাই তার কাছে দুর্বোধ্য, তবু যেটুকু বুঝছে, তাতে তার দৃঢ় ধারণা হয়, তার পূর্বপুরুষেরা যে কাল্পনিক সোনার দেশের স্বপ্ন দেখতো, বাস্তবে কোথাও-না-কোথাও নির্ঘাৎ তার অস্তিত্ব আছে।

তাই অসীম আগ্রহ ও বিস্ময় নিয়ে জুরা যেন গিলছে বুড়ো ইস্কান্দারের কথাগুলো।

বলতে বলতে সর্দার একসময় উড়ন্ত লোহার কার্পেটের কথা বলতেই পার্টিজানরা বললে,—হাঁ, ওটা উড়োজাহাজ।

সর্দার ভাসমান কুঠরির কথা বলতে মুসা সায় দেয়, —হাঁ ওটা স্টীমার।

এমনি করে ধীরে ধীরে সর্দার বলে চলে তার দীর্ঘ কাহিনী।

চুল্লিতে আগুনের শিখা কাঁপছে। কাঁপছে বাতির শিখাও। পামীরের বুকে হিমশীতল নিস্তব্ধ রাত্রি। কামরার মাঝে আলোছায়ার খেলা। রহস্যময় এক অপার্থিব পরিবেশ যেন।

সবশেষে সর্দার বললে,—কিন্তু এ সবই আছে শুধু তাজিকদের দেশে। কোন আহাম্মক কিরঘিজ ওসব আজব জিনিসের লোভে যদি নিজের গাঁ ছেড়ে সে দেশে যায়, তাহলে ধড় থেকে তার গর্দান আলাদা হয়ে যাবে। আগে যা বললাম, সেসব যেমন আমি জানি, তেমনি এটাও জানি। আমাদের মেহ্‌মানরাও তো কবুল করেছেন যে, আমি সব জানি।

মুসার মারফৎ ইভাস্কো এবার জিজ্ঞেস করলে,—সর্দার, আমরা জানতে চাই, আপনি কে, কত দিন আগে নীচের উপত্যকা ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছেন? যে-সব জিনিসের কথা বললেন, তা কোথায় দেখেছেন? এই নিরানন্দ পার্বত্য এলাকায়ই বা পালিয়ে এলেন কেন? আপনি কি কোন ধনী জমিদার, না কোন মোল্লা?

সর্দার বললে,—না, কোথা থেকেও পালিয়ে আসি নি, পালিয়েও কোথাও যাব না। এখানেই জন্মেছি, এখানেই মরবো। দেবতারাই ওসব জিনিস আমায় দেখিয়েছেন।

কত দিন আগে দেখিয়েছেন? অনেক দিন আগে? —মুসা জিজ্ঞেস করে।

বুড়ো বললে,—হাঁ, অনেক বছর আগে...

তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার সে বললে,—ইদীজ নামে আমাদের একজন মরদ ছিল, ওর বাবা, —বলে সে ঘাড় নেড়ে জুরাকে দেখিয়ে দেয়,—ইদীজ ছিল বীর জোয়ান। ওরকম জোয়ান শয়ে একটা মেলে, তিন শো বছরে একবার জন্মায়। একবার সে শিকারে গেল। ঘুরতে ঘুরতে সে চলে যায় বহু—বহু দূর। অজানা পর্বতে পর্বতে সে ঘুরছে বহুক্ষণ। তেষ্টাও পেয়েছে। হঠাৎ বড় একটা ঝরনা নজরে পড়লো। ঝরনার পাশে সে কেবল হাঁটু গেড়ে বসেছে, জল খেতে যাবে, এমন সময় ঝরনার জলের সঙ্গে হঠাৎ একটা আপেল পড়লো ওপর থেকে। কী ব্যাপার! ইদীজ তো অবাক। সে ওপরে উঠতে শুরু করে। উঠছে তো উঠছেই—আরো আরো ওপরে। মারা পড়ে আর কি! শেষে একসময় সে পর্বতের মাথায় গিয়ে পৌঁছলো। বিস্তীর্ণ এক সবুজ বনভূমি সেখানে। কয়েকজন সাদা-মুখো লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা তাজিক —বলতে বলতে বুড়ো ইভাস্কোর দিকে মাথা নাড়ে,—ইদীজকে তারা কত অনুরোধ করলে ওদের সঙ্গে থাকার জন্যে। কিন্তু ইদীজ রাজী হলো না। আপেলটা নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।...অনেক-অনেক কথাই তখন সে আমায় বলেছিল।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মুসা বললে,—কিন্তু সর্দার, আপনার কথা শুনে মনে হয়, এসবই আপনি নিজের চোখে দেখেছেন।

না, ঝুট বাত বলে থাকি তো জিন্দিগি ভর আমার তকলিফের যেন শেষ না থাকে,—বলতে বলতে বুড়ো অস্থিসার কম্পিত আঙুল দিয়ে একখানা পাঁউরুটি তুলে নেয়, সেখানা ভাঙতে ভাঙতে বিড়বিড় করে বলে,—এই রুটিও যেন আমার বরাতে না জোটে। এই পার্বত্য এলাকাতেই আমার সারা জীবন কেটেছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। কিন্তু সর্দারের মনে স্বস্তি নেই। আগন্তুকদের সন্দেহ দূর করার জন্যে সে আবার বললে,—বিশ্বাস করুন আমার কথা, আমি মিথ্যে বলি নি। ইদীজ ছিল আমাদের গোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিমান মরদ। অনেক ক্ষমতা ছিল তার। তার ছেলে জুরাও সে ক্ষমতা কিছু কিছু পেয়েছে।

বলতে বলতে সে জুরার দিকে ফিরে কি যেন বললে ফিস ফিস করে।

জুরার পাশে বাবু বসে আছে। জুরা টুপিটা এক দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম করতেই, বাবু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল, টুপিটা মুখে করে ফিরে এল তার কাছে। আবার জুরা চেঁচিয়ে কি যেন তাকে বললো। এবার বাবু ছুটে গেল তুষারের ভেতরকার অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে। ফিরে এল একটু পরেই। এক বুড়িকে তার ঘাগরার কিনারা কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। বুড়ি আসতে চাইছে না।

সর্দার বললে, আবেগে তার গলা কাঁপছে,—ইদীজ কুকুরদের এমনি ট্রেনিংই দিত। সে যা হুকুম করতো, তা-ই করতো কুকুরগুলো। সোনালী ঈগলকে সে হুকুম করতেই ঈগল গিয়ে শেয়াল ধরে আনতো। তার একটা বিরাট চিতাবাঘ ছিল। সে হুকুম করলেই, চিতাটা পর্বতে পর্বতে ঘুরে বুনো ছাগল শিকার করে নিয়ে আসতো। বুনো জানোয়ারদের যে দেবতা আছে, ইদীজ ছিল তাঁর পেয়ারের মরদ।

বুড়োর কথা শেষ হয়। উত্তেজনায় চোখে জল এসে গেছে। গোঙাতে গোঙাতে আঙুলের ডগা দিয়ে সে চোখের জল মুছে ফেললে। [ক্রমশঃ]

অঘ্রানে

শৈলেন দত্ত

ঐ মাঠের পরে মাঠ
ঐ শালুক দিঘির ঘাট
আজ খুশিতে উন্মন
আজ হাসিতে চনমন।

আজ সারা সকাল বেলা
ফুলে ঘাস-ফড়িঙের মেলা
ভাবে শিউলি বিভোর আজ
বাজে বাতাসে এস্রাজ।

আজ আকাশ ভরা নীলে
পাখী গান ছড়িয়ে দিলে
আকাশ—চাঁপা রোদে নাইতে এসে
আনন্দে আটখান—
আহা! কিসের এ আহবান!

জানো না?—বলছি শোনো তাই—
বাতাসে—কিসের খবর পাই
এত প্রাণের খুশি কিসে—
চেয়ে দ্যাখো মাঠের হাসি
উপচানো ধান-শিষে।

আজ চাষীর ঘরে ধান
তাই আনন্দের এই গান
লক্ষ্মী-ঝাঁপি মাথায় নিয়ে
এসেছে অঘ্রান
নাচে, ওগো নাচে আমার
বাংলা মায়ের প্রাণ।

রঙ্ চঙে

অজয়কুমার নাগ

নীল-নীল দীঘিটার
নীল জল ছলকে,
মাছরাঙা নিয়ে মাছ
উড়ে যায় পলকে।

সাদা সাদা হাঁস ঘোরে
সারা দীঘি ময় রে,
সাদা কাশে শন শন
বায়ু বেগে বয় রে!

নীল-নীল আকাশের
নীল তার চত্বর
চিলটাই দেয় শুধু
বারবার চক্কর!

লাল-সাদা নানা ফুলে
ছেয়ে গেছে বন রে,
ভ্রমরের সাথে তাই
উড়ে গেছে মন রে!

নীল-নীল পাখীটার
ঝিল্‌মিল্ পাখা রে,
নব কচি কিশলয়ে
ভরে গেছে শাখা রে!

টলমল দীঘিজল
ছল ছল ছল রে,
ঝলমল সোনা রোদে
চল্ চল্ চল্ রে!

কে?

নবগোপাল সিংহ

ঠিক সময়ে সূর্যিমামার দেয় ভাঙিয়ে ঘুম
ঘুম পাড়িয়ে আবার করে রাতটাকে নিঝঝুম,
পূর্ণিমারই পূর্ণ চাঁদে লুকায় অমারাতে
কথায় কথায় বাড়ায় কমায় কে বা আপন হাতে?

রাতের তারা দিনের নভে কোথায় থাকে মিশি,
সন্ধ্যাবেলায় কার ইশারায় ঘোরে সপ্তঋষি?
দেখতে না পাই কভু, তবু দেখতে যে চাই তাকে
চালায় আলোর রাজ্যটাকে, বল্ তো খোকা সে কে?

বৈশাখেতে কালবোশেখী বর্ষণ বর্ষাতে
ঘাসের বুকে মানিক জ্বালায় শিউলি-ঝরা প্রাতে,
হেমন্তে বসন্তে শীতে যখন যা নিয়ম
কার সে নিপুণ চালনাতে হয় না ব্যতিক্রম?

চাই বা না চাই মিষ্টি হাওয়া বইছে অহরহ্
কর লাগে না, রবিকরের তবু সমারোহ,
পঙ্কজেতে গন্ধ ঢালে মধু সে কিংশুকে,
অলক্ষ্যেরই এই জাদুকর বলো তো খুকু কে?

কাটুম-কাটুমী

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কাটুমী ॥

"কাটুম, কাটুম, কাটুম রে,
কুটুম এল বাড়ি,
চাল নিয়ে আয়, ডাল নিয়ে আয়,
চাপাই ভাতের হাঁড়ি।
তেলের কাঠা ঢন্ ঢন্ ঢন্,
চান করবে কিসে,
তেল নিয়ে আয়, নুন নিয়ে আয়,
আনবি হলুদ মিশে।
কি বললি, নেইকো কড়ি,
যা নিয়ে আয় তড়িঘড়ি,
নেই বললে কে শুনছে,
কুটুম এল বাড়ি,
চাল নিয়ে আয়, ডাল নিয়ে আয়,
চাপাই ভাতের হাঁড়ি।"

কাটুম ॥

"ও কাটুমী, ও কাটুমী,
বললি কথা ভালো,
নেইকো পিদিম, তেল সলতে,
জ্বালবি ঘরে আলো!
কুটুম এল, কি করি বল্,
নেই কো কড়ি ঘরে,
কে দেবে ধার শুধাই তোরে—
নিত্যি বছর ধরে।
কি বললি, দিতেই হবে?
ঘরদোর তোর রইল তবে।
আমার হাত কেটে দিই, পা কেটে দিই,
যা করবি কর্—
তুই কুটুম খাওয়া, চল্ল আমি,
রইল বাড়িঘর!"
কাটুম গেল কোথায় উড়ে
কাটুমী যায় পাছে,
আজও তারা বিবাদ করে
বেড়ায় গাছে গাছে।
কাটুমী বলে—কুটুম এল,
কুটুম এল বাড়ি,
চাল নিয়ে আয়, ডাল নিয়ে আয়,
চাপাই ভাতের হাঁড়ি।

ঘেরাও

সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

চারদিকেতে 'ঘেরাও! ঘেরাও!'
রব উঠেছে জোরসে,
'ঘেরাও' চালে দাবী আদায়
চলেছে 'ফুল ফোর্সে'!
উজীর ঘেরাও, নাজির ঘেরাও,
কারখানাতে মালিক ঘেরাও,
ঘেরাও হলো ক্ষেত-খামারের
বাস্তুঘুঘু জোতদার—
আঁতকে ওঠে সবাই যারা
পরের ধনে পোদ্দার!
ঘেরাও-নীতি জাগায় ভীতি—
এক চালেতেই মাৎ,
কাল ছিল যার বাঘা দাপট
আজ সে কুপোকাৎ!
পাল্টা ধ্বনি ঃ 'ফেরাও, ফেরাও,
ঘেরাও করার রেওয়াজ ফেরাও,
ফেরাও জুলুম আইন ভাঙার,
বাঁধন কষো জোরসে—
চোখে শুধু দেখছি যে ফুল
হলুদ-বরণ সর্ষে!'
'ঘেরাও' জুজু ভয় জাগালো
মহাকাশের দেশেঃ
'রকেট'-মিছিল কখন্ বুঝি
ঘেরাও করে শেষে!
ঐ স্পুৎনিক, আলফা, লুনিক,
ঘোরে গ্রহের এদিক-ওদিক,
জেমিনি আর অ্যাপোলোরা
খোঁজ নিয়েছে এসে—
একে একে সব গ্রহকে
ধরবে বুঝি ঠেসে!
মহাকাশের গ্রহেরা তাই
আজকে দিশেহারা,
কখন্ কোথায় ঘেরাও হবে
সদাই ভেবে সারা!
চাঁদ ভাবছে, কোথায় পালাই!
শুক্র ভাবে, হায়! কোথা যাই?
মঙ্গলকে অমঙ্গলের
ভয় দিয়েছে নাড়া—
'ঘেরাও' হয়ে সব রহস্য
হবে কি হাতছাড়া!

একটি অভিযান

অমলেন্দুনাথ ঘটক

পরীক্ষার পর পটলার মনে হলো, পৃথিবীটা যেন মহাশূন্য হয়ে গেছে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। সেই যে কবে রেজাল্ট বেরুবে, তার ঠিক নেই। শুয়ে বসে আর পাড়ার ছেলেদের নিয়ে গুলতানি করেও সময় ফুরোতে চায় না।

নেদুমামা বললেন—রেজাল্ট যা হবে, তা ত সকলেরই জানা আছে। এবার হায়ার সেকেণ্ডারীতে পটলার রেজাল্ট সাদা কালিতে বেরুবে। মানুষের চাঁদে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রে যাওয়াও সম্ভব হবে, কিন্তু পটলার পক্ষে একবারে পাস অসম্ভব।

নেদুমামা অনেক চিন্তা করেই নাকি ঘোষণাটা দিলেন। চিন্তা করবার যথেষ্ট কারণও ছিল। টেস্ট পরীক্ষার খাতায় পটলা যা লিখেছিল, তা শুধু ভয়াবহই নয়—বিধ্বংসী। অন্য দেশ হলে কি হতো বলা মুস্কিল। হয় পটলাকে গিলোটিনে চড়ান হতো, অথবা সাতদিনের ফাঁসী হতো।

'রাষ্ট্র' কাকে বলে?—এর উত্তরে পটলা লিখেছিল, ধৃতরাষ্ট্র একটি আদর্শ রাষ্ট্র। পটলার ইতিহাসের খাতা দেখা আর বিধ্বস্ত হিরোসিমা শহর দেখা একই ব্যাপার! পটলার মতে শেরশাহ ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত করেন, ইতিপূর্বে কোন ঘোড়া ডাকতে পারত না। 'ময়ূর সিংহাসনে'র দাম পঁচিশ পয়সার বেশী হওয়া উচিত নয়, কারণ গোটা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর দামই যখন চার টাকা মাত্র!

পটলার এসব উত্তরে স্কুলে একটা সোরগোল পড়ে যায়। হেডমাস্টার কলিঙ্গবাবু দু দিন শয্যাগত থাকার পর স্বয়ং পটলাদের বাড়িতে এলেন। খাতাগুলো বাবাকে দেখালেন। কলিঙ্গবাবু বাবার বন্ধু। তাই সে যাত্রা রক্ষা পেল পটলা।

ইতিহাসের শিক্ষক বললেন—এ সব সাক্ষাৎ সংক্রামক রোগ। এদের কোয়ারেনটাইন-এ রাখা উচিত!

নেদুমামা বললেন—এ সব হবে, আমি জানতাম। অনেক দিন দেখেছি, পটলা 'অকোপাই' শব্দটাকে পড়ছে 'অক্কাপাই'।

পটলার এতে ভ্রূক্ষেপ নেই, বললো—কুচ পরোটা নেহি হ্যায়। ফাইনালে দেখে নেব। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। পরীক্ষার খাতা যদি ঠোঙা হয়ে মুদির দোকানে না যায়, তবে এই পটলাই নিয়ে আসবে সোনার মেডেল। তখন অবিশ্যি হেডস্যারকে আবার আসতে হবে, তবে হাতে ফুলের মালা নিয়ে।

নেদুমামা পটলাকে একবার কোন্ একজন মহাপুরুষের কথা শুনিয়ে ছিলেন।

পটলা বললো—ওসব গ্রেটম্যান হয়ে লাভ নেই।

নেদুমামা রেগে উঠলেন ভয়ংকরভাবে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন—হোয়াট! লাভ নেই মানে?

—মানে আবার কী! লোকজন বেজায় নাম ধরে ডাকে। এই দেখ না, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেয়ে বয়সে কত বড় ছিলেন, অথচ পরীক্ষার সময় দেখলাম, সবাই খাতায় লিখছে—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন.....

নেদুমামা বললেন—ওতে মহাপুরুষের অবমাননা হয় না পটল, তাঁদের শ্রদ্ধাই দেখান হয়।

—ছাই হয়! রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাই ডাকছে 'মণি উকিল', 'শৈলেন ডাক্তার', 'তপন মাস্টার'! এ কত বড় অন্যায় বল ত মামা? এরা কি আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট?

অকাট্য যুক্তি! নেদুমামা মাথা চুলকোলেন কিছুক্ষণ, শেষে বললেন—তুই লজিক পড়্ পটল, তোর উন্নতির যোগ আছে। মা সরস্বতী তোর ঘরে বাঁধা হয়ে থাকবে। প্রতিদিন আর কিছু না হোক, একটা করে রাজহাঁসের ডিমের ওমলেট খেতে পাবি।

তোফা! লাখ কথার এক কথা! পটলা মনে মনে লাফিয়ে ওঠে। এই না হলে নেদুমামা! কিন্তু এ রকম ড্রাই-আশীর্বাদে ভুলছে না পটলচাঁদ। এক প্লেট ঘুঘনি যে করেই হোক আজ ম্যানেজ করতে হবে। পটলা নেদুমামাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলো।

—মামা এবার দক্ষিণাটা।

নেদুমামা ভাগ্নেকে একটা আধুলি বের করে দিলেন।

ওপাশে পটলার বন্ধুরা অনেকক্ষণ ধরে সব উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। পটলা বেরিয়ে আসতেই সব ঘিরে ধরলো—কি রে ম্যানেজ হলো?

—হবে না মানে! যা একখানা ডাইভ খেলাম পায়ে, না দিয়ে পারে!

কাল যেতে হবে মশাট। আমাদের জরুরী কমিটি মিটিং বসেছে। মার্টিনের ট্রেন। মশাটে নেবে সেখান থেকে বনমালীপুর। তিন মাইল গরুর গাড়ি। বিশুদার বিয়ে। যা একখানা অ্যাডভেঞ্চার হবে না! ভাবাই যাচ্ছে না! অ্যাপোলো চড়ে চাঁদে যাবার মত। বিশুদার বিয়ের খবরটা পাওয়া ইস্তক পটলা পেটে রোদ লাগাচ্ছে। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। ডু অর ডাই।

বনমালীপুরের ল্যাংচা নাকি একটা ভারতবিখ্যাত জিনিস। আমেরিকান, জার্মান টুরিস্টরা নাকি এত ধকল সহ্য করেও ল্যাংচা খেতে যায় বনমালীপুরে। চন্দ্র-অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং-আলডারিন কোন দিন যদি ভারতভ্রমণে আসেন, তবে তাজমহল দেখাবার আগে বনমালীপুরের ল্যাংচা টেস্ট করানো হবে,—একথা ভারত সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

বিশুদার ভাগ্য ভাল। যাকে বলে ল্যাংচা ভাগ্য। তবে দুঃখ হচ্ছে—বেচারীকে সেদিনটা উপোস করে থাকতে হবে।

ভোম্বল, সোনা, শঙ্খ সবাই বললো—আমরা বরের সঙ্গে যাব না। পরে যাব। পটলাকে তারা লীডার ঠিক করলো। নেদুমামা বিশুদার সঙ্গে যাবে, কারণ দুজন পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাছাড়া নেদুমামার সঙ্গে যাওয়া মানে একটা স্কুলের সঙ্গে যাওয়া। সারা রাস্তা জ্বালাবে, বলবে—বল্ তো পটল, লিমপোপো নদী কোথায়, টিটিকাকা হ্রদ কোথায়? ভেনিজুয়েলার রাজধানীর নাম কি?

তার চেয়ে বাড়িতে বসে ঐকিক নিয়মের অঙ্ক কষা অনেক ভাল। ঘোড়াগুলোকে ঘাস করা ঢের সোজা।

বিশুদার ওসব বালাই নেই। খেতে পেলেই খুশী। নেহাৎ নিজের বিয়েতে খেতে নেই, নইলে হয়ত এক লরি ল্যাংচাই দিত শেষ করে।

এখন নাকি বিশুদার খাওয়া পড়ে গেছে। নেদুমামার কাছে গল্প শুনেছে পটলা,—একবার কোন এক ফিস্টে খিচুড়ি পুড়ে গেছল। কেউ খেল না। বিশুদা এক ডেকচি পোড়া খিচুড়ি শেষ করে দিল। আগে নাকি একটা গোটা পাঁঠা শিং ভেঙ্গে পেটের মধ্যে পুরে ফেলতে পারতো বিশুদা। গায়েও ছিল তেমনি জোর। একবার নাকি তালতলা ক্লাবকে একাই বারোখানা গোল দিয়েছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা নিগ্রো সৈনিকের মাথার চুল ছিঁড়ে কার্তিকের গোঁফ করেছিল। সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার!

দুপুর থেকেই আকাশে মেঘ জমছিল অল্প অল্প করে। বিশুদা তার দলবল নিয়ে আগে থাকতে বেরিয়ে পড়ল। বর্ষাকালের আকাশ—বিশ্বাস আছে কিছু! বলা যায় না, কখন কী ঘটে যায়। তাছাড়া এসব শুভ কাজে দেরী করা উচিতও নয়। কত অঘটন ঘটে যেতে পারে রাস্তাঘাটে!

নেদুমামাকে আজ বেশ পরিষ্কার লাগছে। শুধু পেছনের কয়েকটা চুল যা দাঁড়িয়ে আছে মোরগের পালকের মত। অনেক চেষ্টা করেও সেগুলোকে বাগে আনতে পারলো না নেদুমামা। যাবার আগে পই পই

করে বলে গেলেন—মোটেই দেরী করিস না পটলা! অনেকটা রাস্তা কিন্তু, দিন থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়বি।

শঙ্খ বললো—চণ্ডীতলা থেকে কটা 'মনোহরা' কিনে নিতে হবে। মিষ্টিটা বেশ উপাদেয়। একবার মাত্র খেয়েছিলাম জীবনে। ফুলদির বিয়েতে। এখনও মুখে লেগে আছে!

এটাকে নিয়েই পটলার যা চিন্তা। রাস্তায় বেরুলেই খাই খাই। একেই ত বুকের ছাতি দেখে মনে হয় যেন ফুটবল খেলার স্টেডিয়াম। তার উপরে অম্বল-টম্বল কি সব রোগ বাধিয়ে ফেলেছে এই বয়সেই।

ভোম্বল গম্ভীর ভাবে বললো—সে হবে 'খন, আগে চলতো।

বেশ সুন্দর একটা ফুরফুরে হাওয়া বইছে অনেকক্ষণ ধরে। হাওয়াটাতে ল্যাংচার গন্ধ পেল সোনা। মার্টিনের ট্রেনে চেপে খিদে আর ফুর্তি দুই-ই যেন বেড়ে গেছে।

শঙ্খ বললো—ক পয়সার চানাচুর কেন পটলা। দাঁতটা এখন থেকেই শানিয়ে নেয়া ভাল।

এই রে—দিলে মাটি করে! কোথায় ল্যাংচা-দরবেশ-রাবড়ি-রাজভোগ অপেক্ষা করছে—তার সঙ্গে কিনা চানাচুর! কোথায় রাম আর কোথায় রামছাগল!

মার্টিনের গাড়ি কি একটা স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকটা লেট করে দিল। কোথায় একটা হাট ভেঙেছে; লোকগুলোকে না নিয়ে গাড়ি চলবে না। সবগুলো লোক উঠলে তবে গাড়ি ছাড়বে। এ রকম কাণ্ডকারখানা নাকি হামেসাই এ লাইনে হয়। একবার নাকি ট্রেন কি একটা কারণে দাঁড়ায়নি। গাঁয়ের লোক কয়েকটা বড় বড় বাঁশ নিয়ে এসে গোটা গাড়িটাকেই পালকির মত গাঁয়ে বয়ে নিয়ে গেছল।

অবশেষে গাড়ি ছাড়লো। বৃষ্টিও পড়ছে বেশ জোরে। বাইরে যত বৃষ্টি, ট্রেনের ভেতরে তার চেয়ে অনেক জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। সর্বনাশ! গাড়িতে যে লোকজন একেবারেই কমে আসছে। গাড়ি কখন মশাট পৌঁছবে, তা বোধহয় ঈশ্বরও জানেন না। বৃষ্টিটা আরো চেপে এল।

মশাট স্টেশনে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন রাত দশটা বেজে গেছে! স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত অদৃশ্য।

চারদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। ভোম্বল বললো—নেদুমামা বলেছিলেন, স্টেশনে গরুর গাড়ি থাকবে। কোথায় গরুর গাড়ি! ত্রিসীমানায় কোন জনপ্রাণীর সাড়া পর্যন্ত নেই।

অগত্যা.....

অগত্যা হেঁটে চলাই সাব্যস্ত হলো। হোক জল-ঝড়, ভূমিকম্প, মহাপ্লাবন—ল্যাংচা কিছুতেই ছাড়া চলবে না। কতটা আর রাস্তা—তিন মাইল মাত্র! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলাতেই তো এত বড় লাইন হয়। অনায়াসেই হেঁটে চলে যাওয়া যাবে।

সোনা বললো—একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে। মণির কাছ থেকে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রটা চেয়ে রাখলে হতো। দিক ঠাহর করা মুশকিল। সব দিকটাই তো এখন মহাপ্রস্থানের পথ বলে মনে হচ্ছে।

একদিকে একটা সংকীর্ণ মাটির রাস্তা অস্পষ্ট দেখা গেল।

পটলা বললো—ইউরেকা! নির্ঘাৎ এই রাস্তাটা। আগে বঢ়ো! জয় ল্যাংচা বাবা কী জয়!

সোনা বললো—মিষ্টির আবার দেবতা আছে না কি? দেবতা তো সব মিষ্টিই খায়।

পটলার তখন আবেগ এসে গেছে, আবার জয়ধ্বনি দিল।

বুড়ো মানুষের ফোকলা দাঁতের মত গাঁয়ের মেঠো রাস্তা, তার উপর আবার বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। কোনমতে চলতে লাগলাম আমরা।

যেতে যেতে শঙ্খ সড়াৎ করে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, কে জানে! ওদিকে ভোম্বলকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি আর সোনা কাঁদবো কাঁদবো ভাবছি—গা-ছমছম অবস্থা! ফিস ফিস করে ডাকলাম—ও পটলা! এমন সময় দুদিক থেকে দুটো মূর্তি এসে আমাদের জড়িয়ে ধরল হিম শীতল স্পর্শে, পুজোর মূর্তিগুলোকে এক-মাটি দিলে যেমন লাগে তেমনি যেন অবয়ব!

আমরা আঁতকে উঠলাম। চিৎকার করতে যাব, তার আগেই শঙ্খ যেন আর্তনাদ করে উঠল—ইঃ! অন্ধকারে পাশের গর্তটা ছাই দেখতেই পাইনি। মরুক গে, ল্যাংচাগুলো বোধহয় পান্তা-ভাত হয়ে গেল রে পটলা!

আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার হাত ধরাধরি করে চলতে লাগলাম সবাই। গাছে একটা কাকও চেঁচাচ্ছে না, শিয়ালও রাস্তা পার হচ্ছে না। শুধু আমরা কজন। বেজায় মুশকিলে পড়া গেল বাস্তবিক।

সোনা বললো—আমার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

জলকাদায় একাকার ভোম্বল বললো—চল্ পটলা, ফিরে যাই।

কিন্তু ফিরেই বা যাব কোথায়? কোন্ দিকেই বা হাঁটবো? ঘণ্টা কয়েক বোধহয় হাঁটা হয়ে গেছে এর মধ্যে। পা দুটো অবশ লাগছে। কী গেরোয় পড়া গেল রে বাবা! কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলেম, কে জানে! বিশুদার সঙ্গে গেলেই হতো। পটলার কথা শুনেই তো এই কাণ্ড! না হয় নেদুমামার কাছে জিওগ্রাফি পড়তে পড়তে যেতাম। এখন যে আমাদেরই জিওগ্রাফি পালটে যাচ্ছে!

আরো বোধহয় ঘন্টাখানেক হাঁটবার পর একটা মিট-মিটে আলো দেখা গেল।

ভোম্বল বললো—এসে গেছি, দুঃখের নিশি প্রভাত হলো!

আমরা সেই আলো লক্ষ্য করেই হাঁটতে লাগলাম। না, হাঁটা নয়, বলতে গেলে ছুটছি।

সড়াৎ—সো!

কয়েকটা বিষধর সাপ কিংবা সজারু রাস্তা পার হলো বোধহয়!

বাবা তারকনাথ! এ কোথায় এনে ফেললে বাবা! নদী-জপ-মালা-ধূত-প্রান্তর—কিছুই যে ঠাহর হচ্ছে না। এর চেয়ে চন্দ্র-পৃষ্ঠে লাফানোও অনেক সহজ।

আলোটা স্পষ্ট হলো। খুব কাছাকাছি এসে গেছি।

একটা মাটির ঘর। মনে হলো, লোকজন ভেতরে কেউ আছে।

ভোম্বল ডাকলো—কাকাবাবু!

শঙ্খ ডাকলো—জ্যাঠামণি!

সোনা ডাকলো—জেঠুকাকু!

আর্তকণ্ঠের হাহাকার!

অনেক ডাকাডাকির পর এক ভদ্রলোক একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। থতমত খেয়ে বললেন—এত রাতে! কী চাই?

শঙ্খ বললো—আজ্ঞে, বনমালীবাবু, দুকড়িপুর।

ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—অদ্ভুত ঠিকানা তো!

সোনা বললো—আজ্ঞে ভুল হয়েছে। বৃষ্টি-কাদায় পড়ে আমাদের জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমরা চোর-ডাকাত নই। বনমালীপুরে দুকড়িবাবুর বাড়ি যাব। আমরা বরযাত্রী। আমাদেরই এক দাদার বিয়ে।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, বললেন—তোমরা বসো।

আমরা খাটিয়াতে উপবেশন করলাম।

ভদ্রলোক দেরাজ খুলে ঘড়ি দেখলেন। তার পর বললেন—এখান থেকে বনমালীপুর দশ মাইল রাস্তা। তোমরা ভুল পথে চলে এসেছ। দুকড়িবাবু আমার মেসোমশাই হন। বাড়ির মেয়েরা সব সকালে চলে গেছে। আমি বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। দিন কাল তো ভালো নয়।

আমরা আঁতকে উঠলাম—দশ মাইল! রাস্তাটা বড্ড খারাপ।

ভদ্রলোক বললেন—গাঁয়ের রাস্তা এরকমই হয়। যাক্ এখন আর গিয়ে কী করবে? রাত তিনটে বেজে গেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই ত ভোর হবে। কাল সকালে আমার সঙ্গেই না হয় যেও।

মাথাটা ঘুরে গেল আমাদের, বললাম—তিনটে!

ভদ্রলোক ঘড়ি দেখালেন আমাদের, তারপর বললেন—জামাকাপড় ছেড়ে ফেল। এতগুলো ধুতি তো হবে না, কটা গামছা দিচ্ছি! এসো আমার সঙ্গে।

রাত্রে সেই অবস্থায়ই কোনমতে এক খাটিয়ায় আমরা কজন শুয়ে পড়লাম। গামছাপরা বরযাত্রী সব! ল্যাংচাগুলোই শুধু মা কালীর জিভের মত আমাদের ভেংচি কাটতে লাগলো সারারাত।

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—উত্তমকুমার বটব্যাল

ক্যাব্‌লা—বুঝলিরে হাব্‌লা, আমার মামাবাড়ী ভক্তাবাঁধে একটা এত বড় গোয়ালঘর আছে যেখান থেকে সব গরুগুলো বেরুতে সময় লাগে চার বছর।

হাব্‌লা (কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে)—ওঃ আর এমন কি! আমার মামাবাড়ী চামচিকাপুরে এমন একটা বাঁশ আছে যেটা মেঘকে খোঁচা দিয়ে যে কোন সময়ে ধরাতলে বর্ষাকাল করে দিতে পারে।

ক্যাব্‌লা—তা, সেটা থাকে কোথায়?

হাব্‌লা—কেনরে, তোর মামাবাড়ীর গোয়ালঘরে!

জলদস্যু

ভৈরবপ্রসাদ হালদার

আরব সাগরের উপকূল।

কোথাও কালো পাথরের দেওয়াল জলের বুক থেকেই মাথা উঁচিয়েছে—অশান্ত জলরাশি বারবার মাথা কুটছে সেই পাথরের দেওয়াল ভাঙতে। আবার কোথাও বা পাহাড় আর সাগরের মাঝে সরু একফালি জমি—গাছ-গাছালির অরণ্য। পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট দুর্গও চোখে পড়ে। কোনও কোনও জায়গায় সাগরের একটা অংশ পাথরের দেওয়ালে ফাটলের সৃষ্টি করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। সেখানে ঢেউ-হীন নিথর জলরাশি।

উপকূলের এদিকটায় দ্বীপ নেই। সামনে শুধু সীমাহীন বারিধির বিস্তৃতি।

আরও দক্ষিণে গেলে অনেকগুলো দ্বীপ চোখে পড়ে।

এইখানে এই সমুদ্র-খাঁড়ির আশ্রয়ে বড় বড় সমুদ্র-গামী নৌকোগুলো আশ্রয় নিয়ে থাকে। এগুলো জাহাজ নয়—পালে-ছোটা বড় বড় নৌকো। যেসব নৌকোয় উপকূলের বাসিন্দারা যাতায়াত করে কিংবা যেগুলো মাল নিয়ে চলাচল করে, এ নৌকোগুলো সেরকমও নয়।

মাঝে মাঝে নৌকোগুলো সব একসঙ্গে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে।

উপকূল থেকে কিছুদূরে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে কয়েক মাইল জুড়ে নৌকোগুলো টহল দিয়ে ফেরে। নৌকোর মাঝি মাল্লারা সব লড়িয়ে সিপাই। পিঠে গাদা বন্দুক বেঁধে আর না হয় বর্শা নিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। ওদের মুখ দেখেই বোঝা যায়, ভয় কিংবা দয়া-মায়ার ধার ধারে না।

নজর ওদের দূর সমুদ্রের দিকে।

তারপর অনেক দূরে সমুদ্রের বুকে একটা বিন্দু চোখে পড়ে।

বিন্দুটা ক্রমশ বড় হয়—আরও বড় হয়। এবার ওদের চিনতে কষ্ট হয় না, ওদের সংগ্রহ-করা খবর তাহলে মিথ্যা নয়। জাহাজ আসছে। যবন না হয় হিস্পানী-দের জাহাজ—থানা বন্দরে সওদা করতে আসছে। ওরা হীরে-জহরৎ সোনা-দানা নিয়ে আসে, আর এখান থেকে নিয়ে যায় মশলা-কাপড়-মসলিন। কখনও কখনও ঘোড়া নিয়ে আসে আরব থেকে—এদেশে আরবী-ঘোড়ার বড় কদর।

আসছে! আসছে!

আগুন জ্বালিয়ে, না হয় ধোঁয়া উড়িয়ে টহলদারী নৌকোগুলোর মধ্যে সংকেত ছড়িয়ে পড়ে। ঘোড়ার ক্ষুরের মতন ব্যূহ সৃষ্টি করে নৌকোগুলো সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে যায়।

সওদাগরী জাহাজখানা বিপদের কথা কিছুই জানতে পারে না।

বন্দরে ভিড়বার জন্যে সে এগিয়ে আসে। ঢুকে পড়ে ওদের ব্যূহের মধ্যে।

এবার ব্যূহের পরিসর ক্রমে ছোট হয়ে আসে। শেষে এক সময় ওরা জাহাজখানাকে একদম ঘিরে ধরে বন্দুক ছুঁড়তে থাকে। সওদাগরের জাহাজ হলেও আত্মরক্ষার

জন্য জাহাজে সিপাই-বন্দুক-কামান রাখার রেওয়াজ আছে।

লড়াই বেধে যায় তারপর।

কামানের গোলার ধাক্কায় দু-চারখানা নৌকো ডোবে। বন্দুকের গুলিতে হানাদারদের দু-চারজন মারাও যায়। জাহাজখানা এদের ব্যূহ ভেদ করে পালাতে না পারলে নৌকোগুলো জাহাজখানাকে ঘিরে ফেলে, হানাদাররা জাহাজে লাফিয়ে ওঠে। হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়। আক্রমণকারীদের সংখ্যা বেশী, তাই তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই জেতে। ক্যাপ্টেন আর তার লোকজনদের হাত-পা বেঁধে সব মালপত্র লুঠ করে নেয়।

অনেক সময় হীরা-জহরৎ বেহাত হওয়ার ভয়ে জাহাজের লোকজনেরা ওগুলো গিলে ফেলে।

কিন্তু আক্রমণকারীরা আরও বেশী চালাক।

তারা জোর করে জাহাজের লোকজনদের টক তেঁতুলের জল আর সাগর-জল খাইয়ে দেয়। হড়-হড় করে ওরা বমি করতে থাকে। বমির সঙ্গে হীরে-জহরৎ সব বেরিয়ে আসে।

শুধু লুঠ করেই ওরা ক্ষান্ত হয় না—লুণ্ঠিত জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালায়। দূর-সমুদ্রে জাহাজখানা অসহায় নাবিকদের নিয়ে পুড়তে পুড়তে এক সময় ডুবে যায়।

আরব সমুদ্রের এই আক্রমণকারীরা হচ্ছে জলদস্যু।

আরব সাগরে জলদস্যুর আক্রমণে এমনভাবে বহু জাহাজ ধ্বংস হয়েছে।

সতের শ বছর আগে ঐতিহাসিক টলেমি লিখে-ছিলেনঃ আরব সাগরের এই উপকূল ভাগকে বলা হয় হেপ্টানেশিয়া, অর্থাৎ জলদস্যুদের উপকূল।

সাড়ে ছ শ বছর আগে মার্কো পোলোও লিখে-ছিলেনঃ এটা জলদস্যুদের রাজত্ব। উপকূলে জলদস্যুদের পরিবার-পরিজন বাস করে। জলদস্যুরা সমুদ্রগামী জাহাজ লুঠ করে সংসার চালায়।

দেশের রাজাও জলদস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না।

থানা রাজ্যের রাজা ত জলদস্যুদের সঙ্গে ব্যবস্থাই করে নিয়েছিলেন যে, লুঠের বখরা হিসাবে ঘোড়া চাই তাঁর।

জলদস্যুদের এতে কোনও আপত্তি ছিল না।

জাহাজ লুঠ করে জলদস্যুরা রাজদরবারে যুদ্ধের ঘোড়া ভেট দিত।

দেশী জলদস্যুদের মধ্যে সবসেরা ছিলেন কনোজী আঙ্‌রিয়া। বোম্বাই থেকে মাইল কুড়ি দূরে কোলা-বাতে ছিল আঙ্‌রিয়ার আস্তানা। ওঁর জন্মস্থান ছিল অগ্গাওয়াদি।

ছত্রপতি শিবাজীর নৌবাহিনীতে ছিলেন তুকাজী আঙরিয়া—একজন বীর যোদ্ধা।

জলদস্যু হলেও কনোজী নৌযুদ্ধে ভারী দক্ষ ছিলেন।

ইংরেজ, ফরাসী আর দিনেমাররা তাঁকে যমের মতন ভয় করত। ওদের অনেক জাহাজ কনোজী লুঠ করে আরব সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজরা কনোজীর ভয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বোম্বাই শহর রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল।

সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপগুলোতে জলদস্যুরা লুঠ-করা ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত। কয়েকটা দ্বীপে আবার ওরা দুর্গও তৈরি করেছিল।

কাথিয়াবাড় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত জলদস্যু-দের অত্যাচার চলত। দেশী জলদস্যুদের সঙ্গে বিদেশী জলদস্যুরাও ছিল। আরবের জলদস্যুরা লোহিত সাগর অথবা পারস্য উপসাগর দিয়ে আসত। আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা আসত আফ্রিকা ঘুরে। ভাস্কো-দা-গামা ছিলেন জলদস্যু-সেনাপতি।

ইংরেজ জলদস্যুদের নেতা ছিল ক্যাপ্টেন কিড। কিড ছিল দারুণ দুঃসাহসী।

ইংরেজ সেনারা তাকে ধরে তিলবুরিতে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিল।

আর একজন ইংরেজ জলদস্যু ছিল গ্রীন। স্কট-ল্যাণ্ডে তার ফাঁসি হয়।

জলদস্যু কথাটা আজ অতীতের একটা শব্দ। কারণ, সমুদ্রে জলদস্যুদের সমস্ত প্রভাব এখন নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সব দেশের জাহাজই নিরাপদে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়।

কর্তব্যের আহ্বান

অরুণাভ ভৌমিক

ছেলেটির নাম জন ম্যানর্ড। 'ওসান্ কুইন' নামে যে জাহাজটি বাফেলো ও ডেট্রিয়টের মধ্যে ফ্রাই হ্রদ দিয়ে যাওয়া আসা করত, তারই চালক ছিল এই ছেলেটি।

বয়স বেশী নয় তার। সবেমাত্র কিশোরের তালিকা ছেড়ে নাম উঠেছে। গায়ের রং টকটকে লাল। দোহারা গঠনের চেহারা। এই বয়সেই বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত মাংসপেশীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চোখ দুটো সব সময়ই উজ্জ্বল। ঠোঁটে হাসি মাখানো। দেখলেই তার প্রতি নিজের অজ্ঞাতেই কেমন যেন একটা স্নেহ এসে যায়।

জনের নম্র ব্যবহারের জন্য জাহাজের প্রত্যেকটি কর্মচারীই তাকে স্নেহ করে। ক্যাপ্টেন সাহেবও তাকে বড় ভালবাসেন। নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখেন তাকে। জনেরও ক্যাপ্টেনকে খুব পছন্দ। ক্যাপ্টেন সাহেবের মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই জন কাজ হাসিল করে ফেলে।

গ্রীষ্মের এক তপ্ত মধ্যাহ্ন। প্রখর রোদের তাপে চোখ যেন ঝলসে যায়। ওসান্ কুইন চলেছে বাফেলোর দিকে। হ্রদের ফিকে নীলাভ জল কেটে, চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জাহাজ ছুটে চলেছে।

ছোট্ট ইঞ্জিন ঘরে বসে এক মনে ড্রাইভ করে চলেছে জন। তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে। এতটুকু সময়ও নষ্ট করা চলবে না। তাই সে ড্রাইভ করে চলেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। সুন্দর টকটকে লাল মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে উত্তাপে। ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। তবু শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই তার—কর্তব্যে সে অটল।

ক্যাপ্টেন ডেকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। যাত্রীরা সব নিশ্চিন্ত মনে মধ্যাহ্ন তন্দ্রা উপভোগ করছে। জাহাজ ছুটে চলেছে হু হু করে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেনের নজরে পড়ল, জাহাজের নীচ থেকে যেন একটু একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চকিতে তাঁর শ্যেন দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

ক্যাপ্টেন চীৎকার করে ডাকলেন—'সিম্‌সন্! সিম্‌সন্!'

'এই যে আমি স্যার।'—বলতে বলতে সিম্‌সন্ এসে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন—'এক্ষুণি একবার নীচে যাও। দেখ তো, হঠাৎ ধোঁয়া বেরোনোর কারণটা কি।'

তৎক্ষণাৎ সিম্‌সন্ নীচে নেমে গেল। একটু পরেই ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসে বলল—'সর্বনাশ! ক্যাপ্টেন সাহেব, ভয়ঙ্কর বিপদ! জাহাজে আগুন লেগেছে।'

ক্যাপ্টেন আঁতকে উঠলেন—'বল কী? আগুন লেগেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর বার্তা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জাহাজে—আরোহীদের মধ্যে।

'আগুন! আগুন লেগেছে!!'

জাহাজটা ছিল ছোট। যাত্রীর সংখ্যা ছিল একশোর কিছু বেশী। ভয়ে সবারই মুখ বিবর্ণ। তাদের ভয়ার্ত চেঁচামেচিতে ওসান্ কুইন যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

ক্যাপ্টেন ছিলেন শান্ত স্থির-প্রকৃতির লোক। ঘোর বিপদের মুখেও তিনি অবিচল। তাঁর হুকুমে বালতি-বালতি জলের স্রোত অবিরাম ঢালা হতে লাগল আগুনের ওপর।

এদিকে আর এক বিপদ। ঠিক যেন 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া'! জাহাজে ছিল প্রচুরপরিমাণ রঞ্জন ও আলকাতরা। আগুন পেয়ে সেগুলো হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। লকলক করে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা।

হ্রদের মধ্য দিয়ে যাতায়াতে বিপদের সম্ভাবনা খুব কম। তাই জাহাজে লাইফ-বোট রাখার প্রয়োজন বড় একটা থাকে না। ওসান্ কুইন-এরও তাই কোন বোট ছিল না। তার মানে বিপদের ওপর বিপদ!

জন প্রাণপণে ড্রাইভ করে চলেছে। এত বিপদেও সে স্থির অচঞ্চল—এতটুকু ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি।

আরোহীরা মরণ-আতঙ্কে চেঁচামেচি, ছুটোছুটি করছে। তাদের কেউ কেউ জনের কাছে এসে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলে—'আমরা এখন বাফেলা থেকে কত দূর?'

—'সাত মাইল।'

—'সেখানে পেঁছিতে এখনও কত সময় লাগবে?'

—'বর্তমানে যে বেগে জাহাজ চলছে, তাতে আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো লাগবেই!'

—'এর মধ্যে কোন বিপদ হবে না তো?'

জন মৃদু হেসে বললে—'বিপদ! বিপদ তো আপনারা যেখানে এসেছেন, সেখানেই বেশী। এই দেখুন না, আমার পায়ের তলা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে চান তো এখান থেকে সরে যান।'

স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সব আরোহীই ভয়ার্ত চীৎকারে পিছিয়ে গেল। সবাই এসে ভীড় করল জাহাজের সামনের দিকে। আর পেছনের দিকে মৃত্যু-গহ্বরে হাল ধরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রইল জন। মৃত্যুর শিখা ধিকিধিকি কাঁপছে তার চারদিকে।

ক্রমে ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। চারদিকে কেবল শোনা যেতে লাগল ত্রস্ত ভয়ার্ত চীৎকার—বাঁচাও! বাঁচাও!

ক্যাপ্টেন গলা ফাটিয়ে হাঁক ছাড়লেন—'জন ম্যানর্ড!'

ধোঁয়ার গহ্বর থেকে উত্তর ভেসে এল—'এই যে! এই যে আমি স্যর!'

—'তুমি কি হাল ধরে আছ, জন?'

—'হ্যাঁ স্যর!'

—'জাহাজের মুখ কোন্ দিকে?'

—'দক্ষিণ-পুব দিকে স্যর।'

—'ঐ দিকেই চালাও। তাড়াতাড়ি তীরে ভিড়াও।'

একটু একটু করে আগুনের লোলুপ রসনা জনের দিকে এগিয়ে আসছে। আর একটু...আরও একটু!... এই বুঝি এবার স্পর্শ করল তাকে! জন তবু অবিচলিত—হাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার পাষাণের মতো।

চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার! এক হাতের মধ্যেও কিছু চোখে পড়ে না। ধোঁয়ায় জনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যও চোখ মেলে রাখা যায় না।।

ক্যাপ্টেন আবার হাঁক দিলেন—'জন ম্যানর্ড!'

ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল—'এই যে! এই যে স্যর!'

—'তুমি কি আরও পাঁচ মিনিট হাল ধরে থাকতে পারবে?'

—'ভগবানের দয়া হলে.....'

জনের চুলগুলো আগুনের ছোঁয়ায় পুড়ে কুঁকড়ে গেছে। একটা হাত আর কাজ করছে না—অসাড় হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও লোপ পাচ্ছে। হাঁটু দুটো ভেঙে পড়ে আর কি! মুখ ঝল্সে গেছে। গায়ের পোশাক পুড়ে চামড়ার সঙ্গে সেঁটে গেছে। তবু জন চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে, শক্ত হাতে হাল চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর!

তারপর এক সময় জাহাজ এসে তীরে ভিড়ল। সমস্ত আরোহী এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়। মৃত্যুর হাত থেকে তারা খুব জোর বেঁচে গেছে। জাহাজ ঘাটায় এসে দাঁড়িয়েছে উৎকণ্ঠিত হাজার হাজার লোক। প্রায় অর্ধেকটাই পুড়ে গেছে জাহাজখানার।

কিন্তু জন?

জাহাজ ঘাটে এসে ভিড়তেই জনের অচেতন দেহ ধপ্ করে পড়ে গেল জাহাজের সেই মৃত্যু-গহ্বরের পাটাতনের ওপর।

ক্যাপ্টেন ছুটে গেলেন নীচে জনের কাছে। কিন্তু ততক্ষণে জন চলে গেছে। পড়ে আছে তার পোড়া দেহটা কর্তব্যনিষ্ঠার ভয়ংকর সাক্ষী হয়ে। সজল চোখে ক্যাপ্টেন মাথার টুপি খুলে ফেললেন। সারা দুনিয়া টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানাল মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ বীরকে।

John B. Grough-এর Call of Duty অবলম্বনে

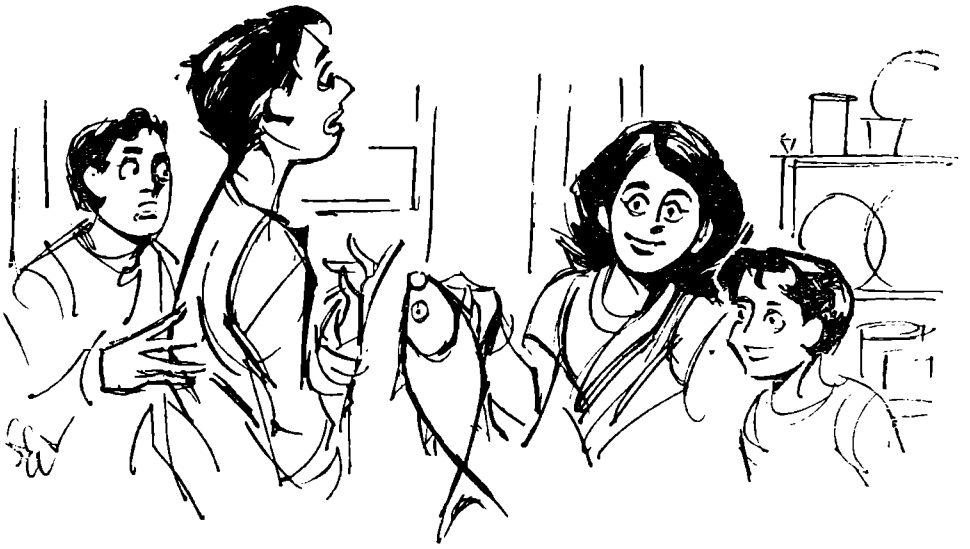

মাছধরার গল্প

রবিদাস সাহারায়

ফুচুদা সেদিন কি কুক্ষণেই না লাটুদের বাড়ি গিয়েছিল!

কুক্ষণই বলতে হবে। নইলে সেখানে গজুকাকুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে কেন? আর দেখা হলেও এমন করে সেদিন গজুকাকু মাছ ধরার গল্প ফেঁদে বসবেন কেন?

ফুচুদাও জানে, যেখানে গজুকাকু সেখানেই মাছ ধরার গল্প। কাজেই সেদিক দিয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু সেদিন সকাল বেলাতেই এমন অঘটন ঘটবে তা কে জানত!

বেলা তখন নটার বেশী হয় নি। ফুচুদা লাটুদের বাড়ি গিয়ে দেখল গজুকাকু সেখানে গল্পের আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। বলছেন তিনি মাছ ধরার গল্প। মাছ ধরায় তাঁর মত ওস্তাদ নাকি ভূভারতে নেই। কোন্ পুকুরে কি মাছ আছে তা তিনি জল দেখলেই বুঝতে পারেন। আর কোন্ মাছের জন্য কি চার দিতে হয় তা তাঁর মত কেউ জানে না। কাজেই মাছকে ঘায়েল করতে তাঁর দেরি হয় না। মাছরা দল বেঁধে ছুটে আসে তাঁর বড়শীর টোপ গেলবার জন্য।

গজুকাকুর গল্প শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে বাড়ির ছেলেমেয়েরা। হাঁ করে সবাই শুনছে সেই গল্প। লাটুও বইখাতা ফেলে সেখানে জমে গিয়েছে।

ফুচুদা যখন ঘরে ঢুকল তখন কেউ তাকাল না তার দিকে। আজ যেন সে অচেনা।

ফুচুদার এতে রাগ ও অভিমান হবারই কথা। যে ফুচুদাকে দেখলে এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করে ওঠে, তাকে ঘিরে ধরে গল্প শোনার জন্য—তার দিকে এখন কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। এ কি সহ্য হয়! হিংসেয় জ্বলতে লাগল ফুচুদা।

সে তখনই চলে যেতে পারত। কিন্তু গেল না। আজই একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে। এক ধারে বসে সে গজুকাকুর গল্প শুনল। গজুকাকু গল্প শেষ করে চলে গেলেন, তখনও সে বসে রইল।

তারপর কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল ফুচুদা। বলল, কিরে, খুব তো মাছের গল্প শুনলি। গজুকাকু তোদের কটা মাছ খাওয়ালো?

ফুচুদার কথা শুনে সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

ফুচুদা বলল, মাছ না খাইয়েই মাছের গল্প শুনিয়ে গেল খুব! ছিঃ! আমি হলে মাছ নিয়ে আসতুম।

লাটুর বোন আন্না বলল, ফুচুদা, তুমি কেন মাছ ধরতে যাও না?

আন্নার মুখ থেকে কথাটা লুফে নিয়ে ফুচুদা বলল, কে বলে যাই না? মাছ ধরা কি শুধু গজুকাকুরই এক-চেটিয়া? আজই তো আমি মাছ ধরে এলাম।

লাটু বলল, সে কি কথা! এখন তো বেলা মোটে

ন'টা। এর মধ্যেই মাছ ধরে ফিরে এলে?

ফুচুদা বলল, তবে কি! মাছ ধরতে গেলে কি তোদের মত কুঁড়ে হওয়া চলে? রাত চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে চলে গেছি, আর ফিরেছি এই একটু আগে।

লাটু বলল, রাত চারটে! তখন তো অন্ধকার থাকে। মাছ অন্ধকারে টোপ চোখে দেখতে পায়?

ফুচুদা বলে উঠল, মাছ কি তোদের মত কানা নাকি? অন্ধকারে যদি ওরা না দেখতে পায়, তবে জলের নীচে চলাফেরা করে কেমন করে? তোদের যে কি বুদ্ধি!—

কথাটা শেষ করতে পারল না ফুচুদা। লাটুর ভাই সাটু জিজ্ঞেস করল, ক'টা মাছ ধরেছ ফুচুদা?

ক'টা? ফুচুদার বুক গর্বে দু' ইঞ্চি ফুলে উঠল। তা কি আর গুণে দেখেছি? দু' চারটে হলে গোণা যেত। এত মাছ কি গুণে হিসাব করা যায়?

আন্না বলল, আমাদের জন্য নিয়ে এলে না কেন ফুচুদা?

এবার ফুচুদার বুক আরও একটু উঁচু হল। ঠিক জায়গায় ঢিল ফেলেছে এবার। সবাই তাকে কেমন আগ্রহে ঘিরে ধরেছে। ফুচুদা বলল, আনতে ভুলে গেছিরে। আসতে আসতেই সব বিলি হয়ে গেল কি না। এ বাড়ি ও বাড়ির সব লোকেরাই চাইতে লাগলো। না দিয়ে কি পারা যায়? তা ছাড়া তোরা কি মাছের ভক্ত? তোরা তো মাছের গপ্প শুনতেই ভালবাসিস্। যাই হোক দাঁড়া, বলছিস যখন—

কথাটা শেষ না করেই ফুচুদা বেরিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, পথের মোড়েই পেয়ে গেল ট্যাঁপাকে। তার বিশ্বস্ত সঙ্গী ও সাগরেদ ট্যাঁপা। আরও ভাগ্য ভাল পকেটে ছিল পাঁচ টাকার একটি নোট। আজ সকালেই বিমলের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে।

ট্যাঁপাকে ডেকে ফুচুদা বলল, শোন্, বাজার থেকে একটা গোটা পোনা বা মুগেল মাছ নিয়ে আয় চট্ করে। মাছটা যেন টাটকা থাকে—আর যেন পুকুরের হয়। আধ কিলো বা এক কিলোটাক ওজন হলেই চলবে।

পাঁচ টাকার নোটটা হাতে নিয়েই ট্যাঁপা চলে যাচ্ছিল। ফুচুদা বলল, শোন্, যাবার সময় তোদের বাড়ি থেকে একটা বাজার ব্যাগ নিয়ে যাবি। তাতে করেই ভরে আনবি মাছটা। আমি লাটুদের বাড়িতে আছি। সাবধান, সেখানে একটা কথাও বলবি না। পয়সার হিসেব আমি পরে নিয়ে নেবো 'খন।

ফুচুদা লাটুদের বাড়িতে গিয়ে আবার গল্পের আসর জমিয়ে তুলল। বলল, ট্যাঁপাকে পাঠালাম আমার বাড়ি থেকে মাছ নিয়ে আসতে। দু' একটা যদি বাড়তি থাকে, তবে নিয়ে আসবে।

সে কথা শুনে আনন্দে কোলাহল করে উঠল ছেলে-মেয়েরা, আঃ কি মজা! মাছ আসছে!

ফুচুদা বলল, আর একটু আগে বললে তোদের ঢাউস একটা মাছ খাওয়াতে পারতাম। আমি কি গজু-কাকুর মত কিপ্‌টে?

কথার মাঝখানে একটু থেমে ফুচুদা বলল, ইস্, আজ কি মাছটাই হাতছাড়া হয়ে গেল! নইলে আজ এমন মাছ তোদের খাওয়াতাম যে তোরা খেয়েও ফুরোতে পারতিস না।

তাই নাকি ফুচুদা?—সবার মুখে অবাক প্রশ্ন। কি করে মাছটা হাতছাড়া হল?

ফুচুদা বলল, যখন ফাতনাটা ডুবছিল, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম মাছটা খুব ঢাউস হবে।

কত বড় হবে?—এক সঙ্গে প্রশ্ন করল অনেকেই।

ফুচুদা বলল, দশ বারো কিলো ত হবেই।

ওমা! এত!—চোখ গোল হয়ে গেল সবার।

এত কি! হয়তো আরও বড় হবে। বিশ কিলো ওজনেরও হতে পারে। মাছটাকে খেলিয়ে খেলিয়ে প্রায় পাড়ের কাছে এনেছি—অমনি ছিপের সুতোটা গেল ছিঁড়ে।

গল্প করতে করতে কখন যে বিস্তর সময় কেটে গিয়েছে তা ফুচুদাও টের পায়নি। হঠাৎ দেখতে পেল ট্যাঁপা ব্যাগে ভরে মাছ নিয়ে এসেছে।

ভেরি গুড্ বয়! যা, মাছটা রান্নাঘরে মাসীমার কাছে দিয়ে আয়।—ফুচুদার মুখ থেকে কথাটা বের হতে না হতেই ছেলেমেয়ের দল ছুটে চলল রান্নাঘরের দিকে। আর পিছু পিছু ফুচুদাও চলল।

পাটু তাড়াতাড়ি ব্যাগটা ট্যাঁপার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাছটা মাটিতে ঢেলে দিল। সবার চোখ ঠিকরে গিয়ে পড়ল মাছটার ওপর। ওকি! এ যে ইলিশ মাছ!

সাটু বলে উঠল, পুকুরে ইলিশ মাছ থাকে নাকি?

আন্না বলল, মাছটার ঠোঁটে বড়শীর দাগ কোথায়?

ফুচুদার অবস্থা তখন কাহিল। চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে ট্যাঁপার দিকে। অন্য সময় হলে গাঁট্টা মেরে ওর কপালে একটা বড় নৈনিতাল আলু গজিয়ে দিত। কিন্তু হায়, ট্যাঁপাও যে নিরুপায়! সে কি করে বোঝাবে যে, বাজারে ইলিশ মাছ সস্তা দেখে একটা গোটা ইলিশই সে নিয়ে এসেছে ফুচুদাকে খুশী করবার জন্য!

ট্রয়ের বীর সৈন্যদের কাছে বাধা পেয়ে তাদের হতাশ হতে হলো।

এমনি করে চললো যুদ্ধ। গ্রীকরা নিরুপায়ঃ কি করে দখল করবে ট্রয়?

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন ভোর বেলা ট্রয়ের সৈন্যরা অবাক হয়ে দেখলো, গ্রীক সৈন্যরা নেই! কোথায় গেল তারা? তাহলে বোধহয় ট্রয়ের ভেতরে ঢুকতে না পেরে হতাশ হয়ে তারা যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই আবার দেশে ফিরে গেছে।

আনন্দে নেচে উঠলো ট্রয়ের লোক। সমস্ত শহর জুড়ে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এক-আধ দিন নয়, এক-আধ মাস নয় বা এক-আধ বছরও নয়—দীর্ঘ দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ তাদের দেশ শত্রুকবলমুক্ত। সুতরাং আজ যদি তারা আনন্দ না করে তো কবে করবে?

অনেক, অ—নে—ক কাল আগেকার কথা—হাজার হাজার বছর আগে।

যে সময়কার কথা বলছি, সে সময়ে ট্রয় নামে মস্ত বড় আর খুব সুন্দর একটা শহর ছিল। শহরটা ছিল এশিয়া মাইনরে—এখন যেখানে তুরস্ক! বিরাট বড় দেয়াল দিয়ে শহরটি ছিল ঘেরা। বাইরের কোন শত্রু মস্ত বড় সেই দেয়াল টপ্‌কে চট্‌ করে শহরের ভেতরে ঢুকতে পারতো না।

সেই সময় হঠাৎ ট্রোজানদের অর্থাৎ ট্রয়ের লোকদের সাথে গ্রীকদের বিষম যুদ্ধ বাধলো। দূর গ্রীস দেশ থেকে গ্রীকরা এল সমুদ্রপথে—পালতোলা জাহাজে করে। দেওয়ালের বাইরে সমবেত হলো হাজার হাজার গ্রীক সৈন্য। আর দেওয়ালের ভেতর থেকে ট্রয়ের সৈন্যরা তাদের প্রতিরোধ করতে লাগলো।

প্রায় দশ বছর ধরে গ্রীকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাল—শহরের ভেতরে ঢুকতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! প্রতিবারই

'গ্রীকরা চলে গেছে!'—এই বারতা ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মত। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল—ব্যাপার কি দেখতে।

দেয়ালের ওপর উঠে তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো—না, সত্যি গ্রীকরা চলে গেছে। আশেপাশে একজনও গ্রীক সৈনিককে দেখা যাচ্ছে না।

তারা তাকালো আরো দূরে।

হ্যাঁ, অনেক—অনেক দূরে, সাগরের ওপরে দেখা গেল, কয়েকটি পালতোলা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে গ্রীসের উদ্দেশ্যে—জাহাজবোঝাই গ্রীক সৈন্য।

ট্রয় শহরের প্রাচীরের সিংহদ্বার খুলে গেল। ট্রয়বাসীরা হাসিহাসি মুখে সেই খোলা দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এল পিলপিল করে—দীর্ঘ দশ বছর পরে। যেখানে এত দিন ধরে গ্রীক সৈন্য তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল, সেখানে ট্রয়বাসী ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো নির্ভয়ে।

কিন্তু হঠাৎ এ কী কাণ্ড! প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের ধাক্কায় ট্রয়বাসীরা হকচকিয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে তারা আবিষ্কার করলো—বিরাট একটা কাঠের ঘোড়া গ্রীক সৈন্যরা ফেলে রেখে গেছে দেওয়ালের বাইরে, মাঠে।

ঘোড়াটার পাগুলো তো পা নয়—যেন মস্ত মোটা আর বড় এক-একটা বট গাছ। ঘোড়াটার চওড়া পিঠে বসে অনায়াসে এক হাজার ছেলেমেয়ে আরাম করে মজা লুটতে পারে। ঘোড়াটার মাথা যেন গগনস্পর্শী।

ঘোড়াটা কোথা থেকে এল, কিভাবে এল আর কেনই বা এল—রহস্য রয়ে গেল এসবও।

কেউ কেউ বললো, 'চলো, এটাকে টেনে আমরা শহরের ভেতর নিয়ে যাই।'

কেউ বা বললো, 'গ্রীকদের ফেলে যাওয়া জিনিস শহরের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার কি দরকার?'

এইভাবে ঘোড়াটাকে কেন্দ্র করে জমে উঠলো নানা রকমের কথাবার্তা, জল্পনা-কল্পনা। এতদিন ধরে যে দেশে চলেছে কেবল যুদ্ধেরই আলোচনা, সেখানে এখন কাঠের ঘোড়া ছাড়া কারও মুখে আর কোন কথা নেই।

শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, ঘোড়াটাকে টেনে শহরের ভেতরেই নিয়ে যাওয়া হবে। যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবেই শুধু নয়, পরম দর্শনীয় জিনিস হিসাবেও ঘোড়াটা ট্রয় শহরের অভ্যন্তরে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

অতএব ট্রয়ের বিরাট পাঁচিলের একাংশ ভেঙে ফেলা হলো। কারণ অত বড় ঘোড়াকে শহরের ভেতরে নিতে হলে পাঁচিল ভাঙা ছাড়া উপায় নেই। তারপর জোয়ান জোয়ান কয়েক শো লোক 'হাইও জোয়ান মারো টান' করতে করতে ঘোড়াটাকে টানতে টানতে শহরের ভেতরে নিয়ে গেল।

তারপর ঘোড়াটাকে নিয়ে সে কী আনন্দের উৎসব শহরের মধ্যে! নাচ, গান, খানাপিনা—সব কিছুই ওই অদ্ভুত ঘোড়াটাকে কেন্দ্র করে। তারপর উৎসব শেষ হলো এক সময়। শ্রান্তক্লান্ত ট্রয়বাসী—গোটা ট্রয় শহর—ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। যুদ্ধ শেষ, শত্রুসেনা পালিয়েছে, দশ বছরের দুর্ভাবনার পর আজ ট্রয় রাহুমুক্ত। সুতরাং এমন আরামের ঘুম কে আর কবে ঘুমিয়েছে?

তারপর?

রাত গভীর...আরো গভীর হলো...

হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল।

নিশ্চল কাঠের ঘোড়া কি নড়ে উঠলো?

না, ঘোড়াটার পেটের মধ্যে লুকোন এক দরজা—হঠাৎ সেই দরজা গেল খুলে!

আর সেই খোলা দরজা দিয়ে ঘোড়ার ভেতর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল ভীষণদর্শন, হিংস্র চেহারার শত শত গ্রীক সৈনিক!

শহরের বাইরেও সে সময় ঘটছে আর এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। গ্রীকরা জাহাজে চেপে গভীর রাতের অন্ধকারে ফিরে এসেছে চুপিচুপি—প্রাচীরের বাইরে। তারাও এবার ভাঙ্গা প্রাচীরের মধ্য দিয়ে শহরে ঢুকে পড়লো।

তারপর সুখনিদ্রায় বিভোর ট্রোজানদের অতর্কিতে যুগপৎ আক্রমণ করলো ভেতরের ও বাইরের হাজার হাজার গ্রীক সৈন্য।

আচম্বিতে এ ভাবে আক্রান্ত হতে হবে—ট্রয়বাসীরা তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তারা বুঝি তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুন্দর সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখছিল। তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা পড়ে পড়ে মার খেল। প্রতিরোধ করবে—এমন ক্ষমতা নেই।

কার্যতঃ বিনা যুদ্ধে ট্রয় পরাজিত হলো।

এইভাবে, সুদীর্ঘ দশ বছরের চেষ্টার পরে—শক্তিতে যা সম্ভব হয় নি, বুদ্ধির বলে তা সম্ভব হলো গ্রীক সেনানীদের পক্ষে। ট্রয় অধিকার করে নিল তারা।

হাজার হাজার যোদ্ধা যা সম্ভব করতে পারে নি, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুললো একটি কাঠের ঘোড়া!

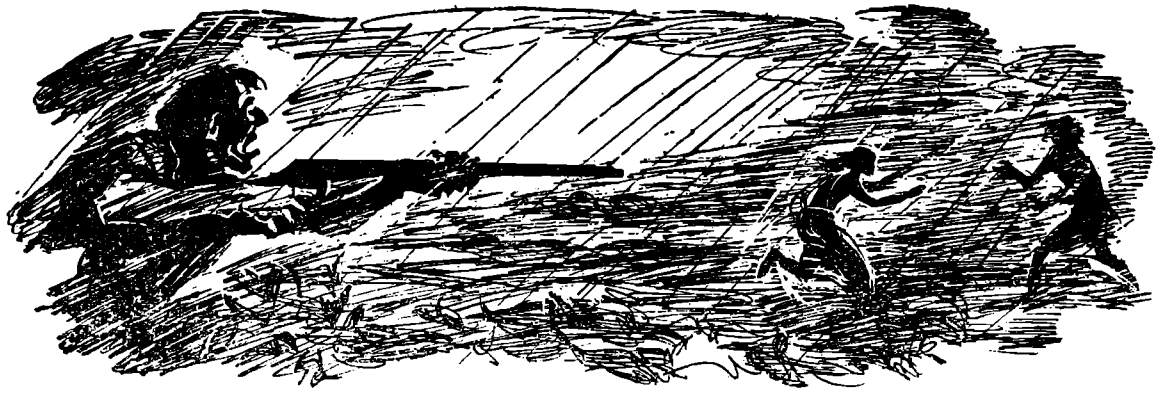

চরণ বৈরাগী

সন্দীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরো নামটা ওর চরণ বৈরাগী। আমরা বলতুম চরণদা। আর আমাদের বাবা-কাকারা ডাকতেন শুধু চরণ বলে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ছোট্ট একতারাটি হাতে নিয়ে সবার দোরে দোরে গান গেয়ে বেড়াত চরণদা। ভারী মিষ্টি ছিল ওর গলা। আর তেমনি মিষ্টি ছিল ওর ব্যবহার। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই ওকে ভালবাসত।

গান শুনে কেউ দিত একমুঠো চাল, কেউ বা দুটো আলু, কেউ বা দুটো পয়সা। চরণদা তাতেই খুশী। কেউ কিছু না দিলেও ও কিছু বলত না। গান শুনিয়ে যেত। গানে তার ক্লান্তি ছিল না। একটার পর একটা গান গেয়ে চলত হাসিমুখে।

কোন কোন দিন হয়তো বিকেলবেলা মাঠে বসে আছি। গরম কাল। মিষ্টি হাওয়ায় আমগাছের পাতা-গুলো কাঁপছে। মাথা দোলাচ্ছে বড় বড় ঘাসগুলো।

সামনে তাকিয়ে দেখি, মাঠের ধার দিয়ে চরণদা চলেছে গান গাইতে গাইতে—"সারাটি জীবন ধরিয়া বাসিব তে মারে ভাল....."

আমরা তখন একটু বড় হয়েছি। সেই সঙ্গে ফাজলামি-ইয়ার্কিও কিছুটা শিখেছি। চকিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, চোখ মট্‌কে হেসে আমরা জিজ্ঞেস করতাম, "কাকে তুমি ভালবাস গো, চরণদা?"

চরণদা হাসত। হাতটা আকাশের দিকে তুলে বলত, "ত্রিভুবনেশ্বরকে ভালবাসি গো।"

আমরা হো হো করে হেসে উঠতাম। চরণদা বোধ-হয় আমাদের ইয়ার্কিটা ঠিক ধরতে পারে নি। তবুও হাসত সে।

সেদিনের কথা আজো মনে আছে। এবং সেই কথাই বলছি এখানে।

চরণদাকে হঠাৎ সেবার গ্রামের পথে কদিন দেখতে পেলাম না। এ রকম তো ঘটে না। তাই সময় করে একদিন বিকেলবেলা গিয়ে হাজির হলাম তার ছোট্ট ঘরটিতে। গিয়ে দেখলুম, সে অসুস্থ। মাঠের ধারে একটা খোলার চালের ছোট কুঁড়েঘরে সে থাকে। আমাকে দেখে তো ভারী খুশী। আমরা হলুম জমিদার-বংশ। স্বয়ং জমিদার-তনয় ওর ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছে,—এ কী কম সৌভাগ্যের কথা!

চরণদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কদিন আর তুমি গান শোনাতে যাও না কেন, চরণদা?"

মিষ্টি হেসে চরণদা বললে, "আর ছোটবাবু, বুড়ো হয়েছি। শরীরটে কদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না।"

একা থাকে চরণদা। আর কেউ নেই ওর। কথায় কথায় আমি একসময় বললুম, "বুড়ো বয়সে তোমায় কে দেখবে চরণদা? তোমার কি কেউ নেই?"

অনেক কষ্টে একটু হাসল চরণদা। বড় বেদনা-মাখা সে হাসি। সে হাসি দেখে আমার মনে হল,—না, ছিল, আর পাঁচজনের মত চরণদারও বোধহয় এক-দিন সব ছিল, ছিল সুখের সংসার।

চরণদার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে গেল। সামনের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

বাড়ির সীমানা পেরিয়ে মাঠ পার হয়ে সে দৃষ্টি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে যে এত ব্যথা থাকতে পারে, সেইদিনই প্রথম তা বুঝলুম। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল। মাথা নীচু করে ভাবছি, কি করব। এমন সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফিস ফিস করে চরণদা বললে, "শুনতে চাও সে কথা? তাহলে শোন..."

তারপর কত দিন কেটে গেছে। চরণদা আজ আর নেই। কিন্তু তার সে জীবনের কাহিনী থেকে গেছে মনের মণিকোঠায়.....

আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীটির ওপারে, কোন এক নামহারা গ্রামের প্রান্তে সংসার পেতে-ছিল আমাদের চরণ বৈরাগী। আপনার জন বলতে সংসারে ছিল ওর স্ত্রী আর মেয়ে কান্তা।

ওই একটিই মেয়ে চরণের। অভাবে ভেঙ্গে-পড়া চরণের মাটির ঘরকে চাঁদের মত আলো করে ছিল কান্তা। ওর ফুটফুটে মুখের দিকে তাকিয়ে সংসারের সব অভাব-অনটনের কথা ভুলে যেত চরণ। দুঃখের সংসার তার পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সুখের সুষমায়।

আপন-ভোলা মানুষ চরণ বৈরাগী।

সারাদিন খেটে-খুটে বাড়ি ফিরতে তার রাত্তির হয়ে যেত। হালকা বাঁশের পলকা দরজাটায় টোকা মেরে সে বলত, "ও কান্তা, দরজাটা একবার খুলে দে না, মা।"

লণ্ঠনটা একহাতে ঝুলিয়ে ঝাঁকড়া চুলগুলো উঁচিয়ে এক ছুটে এসে দরজাটা খুলে দিত কান্তা। তারপর ডাগর চোখ দুটো তুলে আশা-ভরা গলায় বলত, "কই বাবা, এনেছো?"

চরণ জিজ্ঞাসা করত, "কী বল দিকিন্?"

"বাঃ, কদিন ধরে তোমায় বলছি না। লাল ডুরে শাড়ী আর কাঁচপোকার টিপ।"—অভিমানে কান্তার গলা বুজে আসত যেন।

একহাত জিভ বের করে, অপরাধীর মত লজ্জা-মেশানো সুরে চরণ বলত, "ওই যাঃ, এ্যাক্কেবারে ভুলে গেছি।"

তারপর একটু কাছে সরে এসে কান্তার মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলত, "রাগ করিস না, লক্ষ্মী মা আমার। কাল তোকে ঠি-ই-ক এনে দেবো, কেমন?"

কান্তা খুশী হয়ে উঠত।

এমনি ভাবে বাপ-মেয়েতে চলত মান-অভিমানের পালা।

সেদিন দুপুরে দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে চরণ। এমনি সময় একটা চুড়িওলাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল কান্তা। আবদারের সুরে বলল "দাও না বাবা আমাকে ঐ কাঁকন চুড়ি দুটো কিনে।"

চরণের কাছে তখন বাড়তি পয়সা একটিও নেই। কিন্তু কান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারল না সে। চুড়িওলাকে বলল, "বাছা, মেয়ে বায়না ধরেছে, আজ তুমি চুড়ি দিয়ে যাও। কাল-ই না হয় পয়সা নিয়ে যেও।"

ধার রাখতে রাজী হল না চুড়িওলা। দুটো কড়া কথা শুনিয়ে, চুড়িগুলো ঝুড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

চরণ সেদিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। কান্তা বুঝতে পারল সব। বাবার কাছে একটু সরে এসে বলল, "ভালই হল বাবা। তুমি আমাকে এর চেয়েও অ-নে-ক ভাল চুড়ি কিনে দিও, কেমন?"

দিন চলছিল এইভাবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দুরন্তপনাও বাড়ছিল কান্তার। সারাদিন রোদে-রোদে গাঁয়ের পথে-ঘাটে সে ঘুরে বেড়ায়। পরের বাগান থেকে কোঁচড় ভরে কুড়িয়ে আনে ঝরে-যাওয়া আম, পেয়ারা, ফলসা, এইসব।

বাগান থেকে সেদিন কাঁচা আম কুড়োচ্ছিল কান্তা। কাল রাতে খুব একচোট ঝড় হয়ে গেছে। গাছের তলায় অনেক আম। দু হাত ভরে কুড়োচ্ছে কান্তা। হঠাৎ ওর সামনে এসে দাঁড়াল কালো, মোটা একটা লোক। পান-খাওয়া লাল দাঁতগুলো বের করে বলল, "কি খুকী, তুমি বুঝি আম খেতে ভালবাস?"

কান্তা একগাল হেসে বলল, "খু-উ-ব ভালবাসি। তুমি দেবে আমাকে কাঁচা আম?"

লোকটা বলল, "নিশ্চয়ই দোব। এসো তুমি আমার সঙ্গে। খুকী, তুমি তোমার মাকে দেখবে?"

কান্তা বলল, "মা তো বাড়িতেই আছে, বাড়ি গেলেই দেখা যাবে। দাও না আমাকে কাঁচা আম।"

লোকটা সে কথায় একটুও কান না দিয়ে বলল, "না খুকী, তোমার বাবা-মা অনেক দূরে আর এক জায়গায় থাকে। তুমি যাবে সেখানে?"

কান্তা ভারী মজা পেয়ে বলল, "ওমা, তুমি কি বোকা গো। আমাদের বাড়ি তো ওই বাগানটা পেরোলেই

তেঁতুল গাছটার পেছনে। ওখানেই তো আমার বাবা-মা থাকে।"

লোকটা কান্তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, "ধরো, ওরা যদি তোমার আসল বাপ-মা না হয়!"

এবার কান্তার ভারী খারাপ লাগল, মুখ ভার করে বলল, "যাঃ, তুমি ভারী খারাপ। আম দেবে না, কিছু না। খালি যত্তো সব বাজে কথা। মিথ্যুক কোথাকার!" বলেই কান্তা ছুটে পালিয়ে গেল। লোকটার ডাকে আর সাড়া দিল না।

বাড়িতে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে চরণকে বলল কান্তা, "জানো বাবা, আজ না একটা ভারী মজা হয়েছে।"

চরণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? অত হাঁপাচ্ছিস কেন?"

কান্তা বলল, "আমি রায়েদের বাগানে আম কুড়োচ্ছিলাম তো। এমন সময় একটা মোটা কালোমতন লোক এসে আমায় বললো, কি খুকী আম নেবে? আমি বললাম, হ্যাঁ নেব, দাও। তা লোকটা কী দুষ্টু, বাবা! আম তো দিলই না, আবার বলে কিনা, তুমি নাকি আমার বাবা নও। আমার বাবা-মা নাকি অনেক দূরে—ও কি বাবা, ওরকম করছো কেন?"

কান্তার কথা শুনতে শুনতে একটা চাপা আতঙ্কে চরণের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুক কেঁপে উঠছে কোন এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়। কান্তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে বলল, "কান্তা, তুই ওমনি করে যখন-তখন মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াস নি, কেমন?"

"কেন বাবা, কি হয়েছে?"—আশ্চর্য হয় কান্তা।

চরণ বলল, "না মানে, বাইরে কত বদ লোক আছে তো। তুই বাড়িতে না থাকলে আমাদের বড্ড ভাবনা হয় রে।"

"ঠিক আছে, বাবা। তাই হবে।"—মাথা হেলিয়ে সায় দেয় কান্তা।

চরণ বলে, "বাঃ লক্ষ্মী মা আমার! যা, এখন খেলগে যা।"

কান্তা চলে যায়। চরণ চুপ করে বসে থাকে।

সবার অলক্ষ্যে যেন এক অশুভ ছায়া নেমে আসছে। এতদিন যাকে তিল তিল করে বুকের সবটুকু স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছে, যাকে নিয়ে রচনা করেছে কত আশার নীড়, আজ বুঝি বা তাকে হারাতে হয়!

দিন যায়।

সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে আসে চরণ। উঠোনের এক কোণে চাঁদের আবছা আলো এসে পড়েছে। কান্তাকে নিয়ে চরণ সেখানে গল্প শোনাতে বসে।

বড় বড় কচু পাতায় চরণের বউ ঢেলে দেয় রাঙা রাঙা চালের ফ্যান-না-ঝরা ভাত। খেতে খেতে গল্প চলে। সে গল্প আগামী দিনের নবীন আশার রঙে রাঙানো স্বপ্নের গল্প।

চরণ হয়ত বলে, "কান্তার আমার ভারী সুন্দর দেখে একটা টুকটুকে বর এনে দোব।"

চরণের বউ হাসে। বলে, "তোমার এই গরীবের মেয়েকে আর কে নেবে?"

ডাগর ডাগর চোখ মেলে কান্তা তাকায় আর শোনে। হয়ত বোঝেই না কিছু।

চরণ বলে, "গরীব হলে কি হয়, মেয়ের আমার রূপ কত?"

কথাটা মুখে বললেও নিজের দারিদ্র্যের কথাটা চরণের মনের মধ্যে খচখচ করে।

যা সে রোজগার করে, তাতে তিনটে লোকের কোনভাবেই চলে না। মোটা সুদে টাকা ধার করতে হয় ফি মাসেই। সময় পেরিয়ে যায়। শোধ আর করা হয় না। মুখঝামটা খেয়ে মরতে হয় ঐ সুদখোর শয়তান রামবিলাসের।

কথা তো নয় লোকটার, যেন এক একটা শেল। সোজা বুকে এসে বেঁধে।

সেদিন সকাল বেলা হঠাৎ রামবিলাস এসে হাজির। হুঙ্কার দিয়ে বলল, "বলি ভেবেছো কি চরণ, রামবিলাস পোদ্দারের সঙ্গে মস্‌করা নাকি?"

হাতজোড় করে চরণ বলল, "ও কথা বলছেন কেন, পোদ্দার মশাই? আপনার দয়াতেই তো বেঁচে আছি। আসছে মাসে আমি ঠিক শোধ করে দেব।"

রামবিলাস বলে, "তা, কত জমেছে সেদিকে খেয়াল আছে?"

হাত কচলাতে কচলাতে চরণ বললে, "আজ্ঞে, বেশ কয়েক মাসের তো জমেছে। আপনি নেহাত দেবতা মানুষ, তাই—"

রামবিলাস বললে, "থাক্—হয়েছে!"

তারপর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে কি ভেবে আবার বলল, "শোন চরণ, তোমায় একটা কথা বলব। সেই মত যদি কাজ করো, তবে তোমার সব দেনা আমি ছেড়ে দেব।"

বিস্ময়-ভরা চোখে তাকালো চরণ।

রামবিলাসের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা কুটিল হাসি যেন ঝিলিক দিয়ে যায়। জানলা দিয়ে উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। উঠোনের কোণে কান্তা খেলছে এক মনে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে রামবিলাস বললে, "তোমার ঐ মেয়েটাকে বাপু, আমায় দিতে হবে।"

দারুণ চমকে উঠল চরণ। আর্ত স্বরে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "বলছেন কি আপনি পোদ্দার মশাই?"

রামবিলাস উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, তা মেয়ে তো আর তোমার নিজের নয়।"

সঙ্গে সঙ্গে যেন নিভে যায় চরণ।

হ্যাঁ, কথাটা তো ঠিক! কান্তা চরণের নিজের মেয়ে নয়—তার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে!

চরণের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ঠাণ্ডা হিম-ঝরা রাতের ঘটনা...

চাঁপাতলার মাঠে সেবার বিরাট মেলা বসেছে, যেমন বসে প্রতি বছর। রাত্তিরে বাড়ি ফিরছে চরণ। শীতের রাত। কনকনে শীতের বাতাস। তার উপর টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

মেলা শেষ হয়ে গেছে। লোকজন নেই বললেই চলে। আলোগুলোও প্রায় সব নিভে গেছে। শুধু একটা জায়গায় কতকগুলো লোকের এক জটলা।

পায়ে পায়ে চরণ এগিয়ে যায়, জানতে পারে ঘটনাটা। একটা কচি মেয়ে পাওয়া গেছে। তার বাপ-মা কোথায়, কেউ জানে না। এখন প্রশ্ন, এই হাড়কাঁপানো শীতের রাতে দুধের বাচ্চাটার দশা কি হবে?

মেয়েটাকে দেখে চরণের কেন কে জানে, বুকটা কেমন করে উঠল। তার নিঃসন্তান পিতৃ-হৃদয়ে সুপ্ত পিতৃ-স্নেহ জেগে উঠল বুঝি। বলল, "বেশ, মেয়েটাকে আমিই রাখব। তারপর খোঁজ পাওয়া গেলে ফিরিয়ে দেব।"

ভিড়ের মধ্যে রামবিলাসও ছিল। সে বললে, "খবরদার চরণ! ও কাজটি করো না। কার মেয়ে, কি জাত—কে জানে!"

চরণ কিন্তু শোনেনি। বলেছিল, "কথায় বলে 'শিশু হল নারায়ণ'! ওর আবার জাত কি?"

সেদিন সেই কনকনে শীতের রাতে দেড় বছরের কচি মেয়েটাকে বুকে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল চরণ। তারপর নিজের ও স্ত্রীর বুকভরা স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে মেয়েটাকে বড় করেছে তারা। চরণই ওর নাম রেখেছে—কান্তা।

কতগুলো বছর কেটে গেছে তারপর। কান্তার বাবা-মা'র কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। খুব সম্ভব ও বোধ-হয় কোন ধনী লোকের মেয়ে ছিল। কারণ ওর গলায় ছিল একটা সোনার হার আর হাতে একটা সোনার মাদুলী।

অতীতের চিন্তা থেকে হঠাৎ যেন ফিরে আসে চরণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকায় কান্তার দিকে। কেমন একমনে ও খেলা করছে। রামবিলাসকে কি করে বোঝাবে চরণ যে, কান্তা ওর নিজের মেয়ের চেয়েও অনেক বড়।

এদিকে তর সইছে না রামবিলাসের। রুক্ষ কণ্ঠে তাড়া দেয়, "কি হে, কি করবে বল?"

চরণ যেন শিউরে ওঠে, বললে, "না পোদ্দার মশাই, এ হতেই পারে না। আর তাছাড়া আপনি কখনো সংসার করেন নি. একটা কচি মেয়েকে নিয়ে আপনার কি লাভ?"

কুটিল হাসি হাসে রামবিলাস। বলে, "উদ্দেশ্য একটা আছে বৈকি। সেটা তোমাকে বলতে হবে, এমন কোন কথা আছে?"

ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চরণ।

এমন সময় এক দৌড়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো কান্তা। হঠাৎ রামবিলাসকে দেখে সে সভয়ে একটু পিছিয়ে গেল। তারপর চরণের কাছে ঘেঁসে এসে বললে, "বাবা, এই সেই লোকটা।"

"কোন্ লোকটা?"

"সেই যে গো," কান্তা জানায়, "যে দুষ্টু লোকটা সেদিন আমাকে আম দেবে বলে দেয়নি আর কী সব বাজে—"

রামবিলাস হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আজ তাহলে আমি উঠি চরণ। ওটা একটু ভেবে দেখো।"

ঘর থেকে সে বেরিয়ে যায়।

পরে অবশ্য সব কথা জেনেছিল চরণ।

কান্তার বাবা-মায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। অবশ্য তাঁরা দুজনেই তখন মৃত। মস্ত ধনী ছিলেন তাঁরা। মারা যাবার আগে তাঁরা যে উইল করে গেছেন, তাতে আছে যে, যদি কোনদিন মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়, তবে সব সম্পত্তি পাবে মেয়েটি, আর যে তাকে এতদিন মানুষ করেছে, সে পাবে সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ।

ও গাঁয়ের উকিল-খুড়োর কাছেই কথাটা জানতে পারে রামবিলাস। কিন্তু সে কথা চরণকে জানায় নি। কান্তার সব পরিচয়ই মিলে গিয়েছিল। সেই থেকেই কান্তার পেছনে লেগেছে লোভী রামবিলাস।

প্রথম একদিন আম দেবার ছল করে কান্তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু পারে নি। এখন এসে ধরেছে চরণকে। ওর ওই এক কথা, "তোমার সব দেনা ছেড়ে. দোব। শুধু মেয়েটাকে আমায় দাও।"

চরণও সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, "দরকার হলে নিজের ভিটে বেচে আপনার ঋণ শুধব, পোদ্দার মশাই। কিন্তু মেয়ে বেচতে পারব না।"

এরপরও রামবিলাস কয়েকবার এসেছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নি।

শেষকালে রেগে উঠেছিল চরণ। বলেছিল, "আপনাকে তো বলেছি পোদ্দার মশাই, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ আমি। আমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। মেয়েকে আমি এমনি করে ছেড়ে দিতে পারবো না। আপনি যান।"

রামবিলাস বলেছিল, "এই তোমার শেষ কথা?"

চরণ জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ।"

রামবিলাসের চোখ জ্বলে উঠেছিল, বলেছিল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

কাহিনীটা এই পর্যন্ত বলেই চরণদা চুপ করে গেল। আমি তখন অতীতে চলে গেছি। ছুটছি কান্তার পিছনে। চরণদা চুপ করতেই যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

চরণদা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল, "তারপর আর কি, ছোটবাবু? পাষাণ ওরা। কান্তাকে আর তার মাকে আমার বুক থেকে ওরা ছিনিয়ে নে গেল।"

আমি শিউরে উঠলাম, "সে কী! কি বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ ছোটবাবু," কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আবার শুরু করে চরণদা—

সে এক ঝড়ের বিকেল। তখনও ভাল করে সন্ধ্যে নামে নি। কিন্তু বোশেখের কালো মেঘ চারদিক আঁধারে ছেয়ে ফেলেছে। ঝড় উঠেছে শোঁ শোঁ শব্দে।

বাড়ি ফিরে চরণ জানতে পারল, একটু আগেই কান্তা আম কুড়োতে বেরিয়ে গেছে। সহসা কেন জানি, কোন্ এক অশুভ আশঙ্কায় তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

তখুনি ছুটে সে বেরিয়ে গেল বাগানের দিকে। ঝড়ের বেগ তখন আরও বেড়েছে। তার সাথে তাল রেখে সবেগে দুলছে যেন লম্বা লম্বা গাছগুলো।

এ বাগান থেকে ও বাগানে ছুটে বেড়ায় চরণ। চীৎকার করে ডাকে, "কা-ন্-তা-আ..." ঝড়ের পাগলা নাচন তোলে বিদ্রূপের প্রতিধ্বনি!

বৃষ্টি নেমেছে বড় বড় ফোঁটায়। কালো আকাশের বুক চিরে জেগে উঠছে বিদ্যুতের ঝিলিক। সেই এক ফালি আলোতে চরণ হঠাৎ দেখতে পায়, কে যেন কি একটা জাপটে ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে।

চরণ ছুটলো তার পিছনে। ও নিশ্চয়ই রামবিলাস। কান্তাকে নিয়ে পালাচ্ছে।

ঘন অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার মধ্যে চরণ চিনতে পারল রাম-বিলাসকে।

চীৎকার করে সে ডাকে রামবিলাসকে, ডাকে কান্তার নাম ধরে।

ছুটে চলেছে ওরা। হঠাৎ থামতে হল রামবিলাসকে। সে ঘুরে দাঁড়াল। পেছনেই বয়ে চলেছে অজয়ের পাগলা ধারা। গর্জাচ্ছে সাপের মত। আর এগোলে নির্ঘাত মৃত্যু।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল রামবিলাস। তারপর কান্তাকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে কি একটা জিনিস হাতে তুলে নেয়।

বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে ওঠে রামবিলাসের বন্দুক। চরণের দিকে তা উঁচিয়ে ধরে সে হিংস্র কণ্ঠে বললে, "খবরদার চরণ, বাধা দিতে এসো না।"

কোন নিষেধ মানে না চরণ। দুহাত বাড়িয়ে দেয় কান্তার দিকে। আর কান্তাও 'বাবা' বলে চীৎকার করে ছুটে আসে চরণের দিকে।

আর ঠিক তখনি গর্জে উঠল রামবিলাসের বন্দুক।

একবার শুধু আর্তনাদ করে কান্তা লুটিয়ে পড়ল।

অজয়ের বালুচরে মিলিয়ে গেল একটা কচি মেয়ের বুক চিরে বেরিয়ে-আসা আর্তনাদটুকু।

গ্রামে আর থাকেনি চরণ। স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু কান্তাকে হারিয়ে তার মা-ও আর বেশী দিন থাকেনি এ সংসারে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে চরণ বৈরাগীর পথ চলা।

কিসের এই জীবন? কার জন্যে এই সংসার? চরণ বৈরাগী গ্রামের রাঙামাটির পথ ধরে একতারা হাতে গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায় আর খোঁজে এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর।

নন্টে আর ফন্টে

কালকের ঝগড়ার কথা ভুলে যা ভাই ফন্টে! এক জায়গায় শশা গাছে যা শশা ধরেছে না— কি বলবো মাইরি!

সেদিন রাত্রে
দেখেছিস ফন্টে? নে বেড়া টপকে ঢুকে পড়, আমি এখানে থাকি।
তুই ঢোক আমি এখানে থাকি।

আরে যার গাছ সে তো নাক ডাকাচ্ছে, তোর আর ভয়টা কিসের!
তোরই বা যেতে তবে আপত্তি কিসের।

আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে ধোলাই খাওয়াবার ধান্দা। মতলববাজ কোথাকার!
মুখ সামলে ফন্টে!

কে র‍্যা? শশা চুরির মতলব বুঝি? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!
উঃ, বাপরে! সাপে কামড়েছেরে!
সেরেচে
কী হবে নন্টে?

চ' এবারে দু' লক্কেলেই ঢুকে পড়ি। সব জেনে শুনে তো আর পালানো যায়না, কি বলিস ফন্টে?
যা বলেছিস! সত্যি যদি লোকটাকে সাপে কামড়ে থাকে, তবে ফেলে চলে গেলে তো পটল ডাঙ্গায় পৌঁছে যাবে!

সাপে কামড়েছে বলে চ্যাচাচ্ছিলে, কোথায় কামড়েছে?
এই পায়ে। আমি আর বাঁচবো না, ওহো হো!
চটপট একটা বাঁধন দিতে হবেরে নন্টে!

চিত্র ও কাহিনীঃ নারায়ণ দেবনাথ

[চলবে]

পাহাড়ের নাম করালী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

নাগাপ্পা ফিরে গিয়ে আর সে জায়গায় বসলেন না। মাটিতে যে একটা ঝোলা গোছের পড়ে ছিল, এতক্ষণ তা দেখতে পাইনি। সেটার মধ্যে নিচে থেকে কি যেন দু একটা জিনিস ভরে নিয়ে ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নাগাপ্পা সামনের দিকে জংলা পাহাড়ের উল্টো দিকের আদিবাসীদের গাঁয়ের পথই ধরলেন।

নাগাপ্পা পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে অন্য দিকের ঢালে একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত একেবারে নিস্পন্দ নীরব হয়ে রইলাম।

চলে যাবার সময় একটিবারও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান-তে নাগাপ্পার মনের সন্দেহ দূর হয়ে গেছে বলে বুঝেছিলাম, তবু সাবধানের মার নেই। নাগাপ্পা পাহাড়ের ওপিঠে নেমে যাবার পরও বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে তারপর সন্তর্পণে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কি করছিলেন সেইটেই জানবার চেষ্টা করতে হবে।

জায়গাটায় পৌঁছে কিন্তু হতাশই হলাম। পাহাড়ী মেঠো জমি, বেশ শক্ত মাটির ওপর এখানে সেখানে শাল কেঁদু বয়ড়া বা অন্য বুনো কাঁটা গাছের চারার ছোট-

খাট সব ঝোপ। খানিকটা দূরেই পাহাড়তলির রাস্তার সেই জায়গাটা যেখানে আদিবাসীর থেঁতলানো লাশ পাওয়া গেছে। আদিবাসীদের সেখানে পোঁতা একটা লম্বা খুঁটির গায়ে বিদঘুটে মুখ-আঁকা একটা মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখার দরুনই জায়গাটা চিনতে পারলাম। বিদঘুটে মুখ-আঁকা হাঁড়িটা ঝোলান হয়েছে ভূত-প্রেত তাড়াবার জন্যে। উপদ্রবটা ক্ষ্যাপা হাতীর বা যারই হোক তার পেছনে ভূত-প্রেতের হাত থাকতে বাধ্য এই তাদের বিশ্বাস।

বিদঘুটে মুখ-আঁকা হাঁড়িটা যেখানে ঝোলানো সেখানকার বদলে এ জায়গায় নাগাপ্পা কি করছিলেন প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর শক্ত লালচে মাটির ওপর একটু যেন কি ঘষার দাগ পেলাম। মাটির ওপর থেকে কোন কিছু চেঁছে নিলে যেরকম দাগ পড়ে অনেকটা সেই রকম।

বঙ্কুবাবুই সে দাগটা প্রথম লক্ষ্য করে দেখিয়ে দিলেন। উৎসাহভরে আমার পাশেই বসে পড়ে বললেন, —নাগাপ্পা কি করছিলেন, বুঝেছেন এবার? কি একটা এখান থেকে চেঁছে তুলছিলেন। এইত ঘষার দাগ।

তা'ত বুঝলাম! গোয়েন্দাগিরিতে বঙ্কুবাবুর কাছে হার মেনে আপনা থেকেই একটু রুক্ষস্বরে বললাম,— কিন্তু চেঁছে তুলছিলেন কি? লোকটা মরল ওই রাস্তায়, এখানে তার কি প্রমাণ ছিল যে সরাচ্ছিলেন!

কি সরাচ্ছিলেন তাও বঙ্কুবাবুরই প্রথম চোখে পড়ল। একটা কাঁটা গাছের তলায় ছোট একটা যেন গোবরের ডেলা পড়েছিল আগে দেখতে পাই নি। বঙ্কুবাবু সেইটে একটা কাঠি দিয়ে টেনে এনে সন্দিগ্ধ-স্বরে বললেন,—এই জিনিস নয় ত?

জিনিসটা কি?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,— গোবরের মত দেখাচ্ছে!

না গোবর নয়! বঙ্কুবাবু এবার জোর দিয়ে বললেন, তবে অন্য কোন জানোয়ারের বিষ্ঠাই মনে হচ্ছে। একটা টুকরো শুধু পড়ে আছে।

নাগাপ্পা এই জিনিস অত তন্ময় হয়ে চেঁছে তুলছিলেন? আমি অবাক হয়ে বঙ্কুবাবুর দিকে তাকালাম,—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

বিশ্বাস ত আমারও হচ্ছে না।—বঙ্কুবাবু আমার কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না,—কিন্তু এখানে ত যত্ন করে নেবার মত আর কিছুই দেখছি না।

এখন আর দেখবেন কি করে!—আমি ঠাট্টার সুরে বললাম,—যা ছিল তা'ত নাগাপ্পা তুলে নিয়ে গেছেন। তবে জায়গাটা ভালো করে একটু খুঁজে দেখা দরকার।

খোঁজ করতে গিয়ে ওরকম একটা মোক্ষম নিদর্শন পেয়ে যাব তা অবশ্য কল্পনাও করি নি।

এবারে আর বঙ্কুবাবু নয়, আবিষ্কর্তা আমি নিজেই।

প্রথমে নাগাপ্পা যে জায়গাটায় বসেছিলেন সেখানটা বেশ তন্ন তন্ন করে দেখে আদিবাসী পিয়নের লাশ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়ী রাস্তার সেই অংশটাও পরীক্ষা করেছিলাম।

কয়েকদিন আগের ঘটনা। পাহাড়ী ডাঙায় বা রাস্তায় সে বীভৎস ব্যাপারের কোন চিহ্নই এখন আর নেই। পাহাড়ের ওপর বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদে ঝলমল করছে চারিদিক, তারই সঙ্গে চারিদিকের বনে যে হাওয়ার মর্মর শোনা যাচ্ছে তা মিলে এমন একটা শান্ত মধুর পরিবেশ গড়ে তুলেছে যে এ পবিত্র জায়গায় অমন একটা পৈশাচিক ব্যাপার কখনো ঘটতে পারে বলেই বিশ্বাস হয় না।

খুনের জায়গাটা দেখবার পর থেকেই বঙ্কুবাবু বাড়ি ফেরার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলেন। দুপুরের খ্যাঁটটার দেরী হয়ে যাবার দুর্ভাবনাতেই তাঁর এই তাড়া বুঝেছি। তাড়ার আসল কারণটা ওই হলেও তাঁর যুক্তিটা খুব অগ্রাহ্য করবার নয়।

যা দেখবার তা ত দেখলেন,—বেশ একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছেন বঙ্কুবাবু,—খুনের খেই পেতে সারা জঙ্গলটাই খুঁজতে হবে নাকি!

মুখে কিছু জবাব না দিয়ে প্রায় সেই আজগুবী কাণ্ডটাই করেছি, আর তাইতেই পেয়ে গেছি সেই আশাতীত খেইটা। পেয়েছি অবশ্য একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায়।

বঙ্কুবাবুকে বিরক্তমুখে পাহাড়ী রাস্তাটার ধারেই বসিয়ে রেখে আশপাশের জঙ্গলটা অকারণেই ঘুরে দেখছিলাম। কাজটা যে আহাম্মুকের মত হচ্ছে সেটা যে একেবারে বুঝিনি তা নয়। কিন্তু বনের ভেতর ঢুকে পড়ে পা দুটো যেন আপনা থেকেই সামনে চলে যাচ্ছিল।

বেশ কিছুটা ওইভাবে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখবার মত কিছুই অবশ্য পাইনি। আর দেরী করলে বঙ্কুবাবু হয় ত ক্ষিদের জ্বালায় রাগ করে একলাই রওনা দেবেন ভেবে ফিরতে গিয়ে হঠাৎ পা হড়কে একটা গর্তের মধ্যেই পড়ে গেলাম।

এখানটা জঙ্গল বেশ গভীর। তলায় শুকনো পাতা

এমন ঘন হয়ে জমে আছে যে মাটি দেখাই যায় না। পা-টা একটা গোল কাটা ডালের ওপর পড়ে হড়কে যাবার পর যে গর্তটার মধ্যে চলে গিয়েছিল ওপর থেকে তার অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায় নি।

অমন বেকায়দায় পড়ে গিয়েও পা-টা যে ভাঙে নি তারই জন্যে ভাগ্যের ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে আবার দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে নিজের জুতোটার দিকে নজর দিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

পায়ে গোড়ালি-আঁটা স্যাণ্ডাল পরা ছিল।

পায়ে আর জুতোয় ওটা কি লেগে?

এ তো কিসের ছাই দেখা যাচ্ছে! এখানে এই জঙ্গলের মাঝখানে ঠিক একটি জায়গায় এরকম ছাই থাকার মানে কি? কাছেপিঠে কেউ কোথায় আগুন জ্বালিয়েছে বা রাঁধাবাড়া করেছে এমন কোন চিহ্নও নেই।

ওপরে নয়, ছাইটা এমন একটা গর্তের ভেতরই বা চাপা দেওয়া কেন?

যেভাবে গর্তের ভেতর রেখে ওপরে শুকনো ঝরা-পাতা চাপা দেওয়া হয়েছে, তাতে লুকোবার চেষ্টাটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

গর্তের ভেতর ছাই-এর সঙ্গে আর কি আছে দেখবার জন্যে সেখানে বসতে গিয়ে শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দে চমকে সেদিকে তাকালাম।

না ভয় পাবার মত কেউ নয়। আমার দেরী দেখে ধৈর্য ধরতে না পেরে বঙ্কুবাবুই বকের মত লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে খুঁজতে এসেছেন।

ক্ষিদের জ্বালায়, অধৈর্যে আর আমার বিরুদ্ধে অক্ষম রাগে তাঁর মুখখানার চেহারা যা হয়েছে তা অন্য কারুর হলে ভয় পাবার মতই বলতাম, কিন্তু বঙ্কুবাবুর বেলা তাতে হাসিই পেল।

কাছে এসে প্রায় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার আমার আর একবার সামনের গর্তটার দিকে চেয়ে বঙ্কুবাবু তাঁর মেয়েলী সরু গলাটাকে যেন আরো তীক্ষ্ণ ছুঁচোলো করে তাঁর অভিমান আর অভিযোগটা প্রকাশ করলেন,—আমায় এমনি করে জব্দ করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছেন! আমায় একলা ফেলে রেখে এসে আপনি খেলা করছেন এখানে!

খেলা নয় বঙ্কুবাবু, খেলা নয়,—বঙ্কুবাবুর গলার স্বরে আর বলার ধরনে হেসে ফেলেও তাঁকে ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—এই গর্তটায় কি পেয়েছি দেখছেন? ছাই।

ছাই!—আমি যেন তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছি এমনিভাবে কথাটা নিয়ে বঙ্কুবাবু আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন,—আমি না হয় মুখ্খু হাঁদা গাঁইয়া, কিন্তু দুটো ভালো মন্দ মাঝেসাঝে খাওয়ান বলে আমার সঙ্গে এরকম তামাসা করাটা কি উচিত ছোট-বাবু? গর্তে ছাই আছে ত আমাদের কি!

বঙ্কুবাবু যত রাগেন তাঁর চেহারা আর গলা তত হাস্যকর হয়ে ওঠে। এবার কিন্তু হাসি সামলে গম্ভীর হয়েই তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে ব্যস্ত হলাম। নিচে থেকে খানিকটা ছাই হাতে তুলে নিয়ে বললাম,—এ ছাই-এর মধ্যে কি দারুণ রহস্যের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা এখনো বুঝতে পারছেন না? ভালো করে চারিদিকে চেয়ে দেখুন। কোথাও আগুন জ্বালার কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন কি?

আমার দিকে যে ভাবে বঙ্কুবাবু চাইলেন তাতে মনে হল আমার মাথা কতখানি খারাপ হয়েছে তা-ই যেন তিনি আঁচ করবার চেষ্টা করছেন। মুখে শুধু একটু বিস্মিত প্রশ্নই করলেন,—আগুন না হলে ছাই এল কোথা থেকে?

ঠিক ধরেছেন!—আমি উৎসাহভরে উঠে দাঁড়ালাম, ছাই যখন রয়েছে তখন আগুন নিশ্চয়ই জ্বালা হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই কেন?

বঙ্কুবাবুকে বোঝাবার নামে নিজের কাছেই যুক্তি-গুলোই ভালো করে সাজাবার চেষ্টা করে বললাম,—আদি-বাসীরা পাহাড় জঙ্গলে আগুন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া জ্বালে না। তারা সাধারণতঃ পাহাড়ের জঙ্গল সাফ করবার জন্যে বা চাষের জন্যে জমি উদ্ধার করতে বছরে একবার চৈত্র বৈশাখ মাসে বনে আগুন লাগায়। এখন সে সময় নয়, আর সে আগুনের প্রমাণ খুঁজতে হয় না। এখানকার আদিবাসীদের পাহাড় জঙ্গলের যেখানে সেখানে রান্নার জন্যে এক বেলার উনুন পাতা দস্তুর নয়, আর সে উনুনও লুকোন থাকে না। এখানকার আগুনের কোন চিহ্ন যখন নেই তখন নিশ্চয়ই তা জ্বেলে তারপর লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বঙ্কুবাবুর চোখে-মুখেও অধৈর্য বিরক্তি কেটে গিয়ে তীব্র আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখে একটু থেমে প্রায় নাটুকে সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম,—লুকোবার কারণ কি?

খুনের ব্যাপারের নিদর্শন গোছের কিছু এখানে পুড়িয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলতে চাইছেন?—বঙ্কুবাবু দু-চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকেই যেন ভেদ করার চেষ্টায় বললেন,—কিন্তু তাই যদি হয়

তাহলেও প্রমাণ ত সব ছাই হয়ে গেছে। এখন আর ও ছাই কি কাজে লাগবে!

এখনো অনেক কাজে লাগতে পারে।—আমি জোর দিয়ে বললাম,—প্রথমতঃ এ গর্তটা থেকে ছাই-এর সঙ্গে অন্য কিছুও হয়ত পাওয়া যেতে পারে। আর তা যদি না পাওয়া যায় তাহলেও ওই ছাই-এর দাম কম নয়! বিশ্লেষণ করে ও ছাই কিসের জানতে পারলে এ খুনের ব্যাপারের একটা কোনো হদিস হয়ত মিলে যেতে পারে!

আর কিছু বলতে হল না। আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি বঙ্কুবাবু গর্তের ধারে বসে পড়ে মুঠো মুঠো ছাই তুলে তাঁর পকেটে ভরছেন।

তাঁর আগেকার রাগ বিরক্তি দেখে যেমন, বঙ্কুবাবুর এখনকার উৎসাহ দেখেও তেমনি হাসি পেল। সে হাসি চেপে গর্তের সব ছাই-ই শুধু নিয়ে যাবার দরকার নেই বলে তাঁকে থামাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার দরকার হল না।

বঙ্কুবাবু নিজেই হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাকেই যেন সাবধান করার ভঙ্গিতে বললেন,—এ গর্ত এরকম ভাবে ঘাঁটা খুব অন্যায় হচ্ছে তা জানেন! আমাদের আনাড়ি হাতের ঘাঁটাঘাঁটিতে আসল যা প্রমাণ তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর কিছু সুতরাং ছোঁয়াও চলবে না।

বঙ্কুবাবুর কথাটা ঠিক। তবু মনের খুঁতখুঁতুনিটা প্রকাশ না করে পারলাম না,—কিন্তু গর্তের তলায় আর কিছু আছে কি না একটু দেখলে বোধ হয় হত!

বঙ্কুবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমার একটা হাত ধরে ফেলে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যেতে যেতে বললেন,—না, তা দেখবার যোগ্য লোক আমরা নই। তা-ছাড়া এখানে আর দেরী করে নাগাপ্পার কাছে কি ধরা পড়তে চান? সে যে কেনো মুহূর্তে এই পথেই ফিরতে পারে তা ভেবে দেখেছেন?

এ কথার ওপর সত্যিই আর বলবার কিছু পেলাম না। বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়েই বঙ্কুবাবুর সঙ্গে সে তল্লাট ছাড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালালাম।

বঙ্কুবাবুর একটা যুক্তি মেনে আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম কিন্তু তাঁর আরেকটা পরামর্শ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার জন্যে নিজেদের লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে অমন আফসোস সেদিন করতে হবে কল্পনাও করি নি।

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে তাঁর জানা সব 'সর্ট-কাট'-এ কিছুদূর নামবার পর এক জায়গায় সাধারণ ব্যবহারের পাহাড়ী রাস্তাটা সামনে পড়েছিল। সে রকম সম্ভাবনা হলেও দুজনে এক সঙ্গে যাতে নাগাপ্পার চোখে না পড়ি—তার জন্যে বঙ্কুবাবু আমায় সাধারণ রাস্তাটা ধরেই লোধমা পাহাড়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি যা কারণ দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে তখন কোনো খুঁত পাইনি। তাঁর পরামর্শ নিয়ে তাই একা একাই লোধমা পাহাড়ের ছাউনিতে ফিরে ছিলাম।

ছাউনিতে পৌঁছে প্রথমেই অবাক হয়েছিলাম বঙ্কু-বাবু তখনও ফেরেন নি জেনে। তিনি যে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আসছেন তাতে তাঁর ত আমার আগে পৌঁছোবার কথা।

বিস্ময়টা শেষ পর্যন্ত ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও বঙ্কুবাবু না ফেরায়।

কাউকে কিছু তখনো জানাতে পারি নি। নিজেই খবর নিয়ে আর যা জেনেছি তাতে আতঙ্ক আরো বেড়েছে। শুধু বঙ্কুবাবুই নয় লোধমা পাহাড়ে নাগাপ্পাকেও কেউ নাকি সারাদিন দেখে নি।

নাগাপ্পাকে তার পর দিন সকালে ফিরতে দেখেছি কিন্তু বঙ্কুবাবু তখনও নিরুদ্দেশ। নেহাত বঙ্কুবাবুর মত মানুষ বলেই আমি ছাড়া কেউ বোধহয় তা লক্ষ্যই করে নি। [ক্রমশঃ]

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—রাম চট্টখুণ্ডী

শিক্ষকমশাই—রাম, গরু কি কি খায়?

ছাত্র—গরু ভাত, ডাল, মাছ, মাংস সবই খায়।

শিক্ষকমশাই—কে বলল?

ছাত্র—কেন? সেদিন পড়া না পারায় আপনিই তো আমাকে গরু বললেন। আমি মাছ-মাংস, ভাত-ডাল, সবই খাই।

চড়াই ও খোকা

মদন রায়

চড়াই পাখী! চড়াই পাখী!
কত ক'রে তোমায় ডাকি,
তবু তুমি দিচ্ছ না কো সাড়া
রাগ ক'রো না লক্ষ্মী সোনা,
ভালোবাসি—চাঁদের কণা ঃ
পুষি কি ফের করছে তোমায় তাড়া?

দেখো না ঠিক পুষিটারে
তাড়িয়ে দেব এক্কেবারে,
ভেবেছে কি বাঘের মাসী ব'লে-
আমার কথা শুনবে না সে?
তোমায় আবার ধরতে আসে?
আদর ক'রে নেবো না আর কোলে।

আরশোলা আর ভাজা কড়াই
তোমায় দেব ঃ পুষির বড়াই
ভাঙ্গবে ঠিকই ফেলবে চোখের জল।
দেবো না কো মাছের কাঁটা
দুধ দেবো না, দেবো ডাঁটা
বুঝবে তখন অবাধ্যতার ফল।

ডাকলে 'ভুলো' চাপা গলায়
বাঘের মাসী খাটের তলায়
লেজ তুলে সে পালিয়ে কেন যায়?
চোখ ঘুরিয়ে, গা ফুলিয়ে,
লেজটাকে সে যায় দুলিয়ে—,
ডাকলে 'ভূ-লো'—লুটিয়ে পড়ে পায়।

কাঁদছ তুমি! খুঁজছ কাকে?
না, কেঁদো না, ডাকছ মাকে?
মা যে তোমার আসবে খানিক পরে।
তখন তুমি মায়ের কাছে
বলবে গিয়ে—মা কী আছে?
কী এনেছ আমাদের এই ঘরে?

সাত সকালে

চুনী দাশ

খুশির সুরে শিশির ঝরে
সবুজ পাতা একটু নড়ে,
একটু নড়ে—সবুজ পাতা—
ফের চুপি ও নোয়ায় মাথা।

একটু নামা একটু ওঠা
মৃদু হাওয়ায় একটু ছোটা,
বড়ো মধুর এই যে খেলা
শিশির ভেজা সকাল বেলা।

রোজ ভোরে ও আপন মনে
খেলবে খেলা শিশির সনে
রাঙা সকাল আসলে নেমে
হঠাৎ খেলা যাবেই থেমে।

থামলে খেলা সবুজ পাতা
সোনার রোদে শুকোয় মাথা।
সুয্যি মামা ডাকবে যেই
নতুন খেলা জুড়বে সেই॥

ঝিক্‌মিক্‌ ট্রেন

বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত

ঝিক্‌মিক্‌ ট্রেন সোনারপুর
মামার বাড়ি কতো দূর?
সয় না দেরি সয় না আর
মামার বাড়ি গাঙের পার॥

মামার বাড়ি মজার বাড়ি
ট্রেন হলো তোর পা কি ভারি?
ভাবছে দিদা দোরের কাছে
আর কি যাবার সময় আছে॥

ঝিক্‌মিক্‌ ট্রেন সোনারপুর
মাঠ ভরা ধান কনকচূড় ঃ
কনকচূড়ের টাটকা খৈ-য়ে
পেট পুরে খায় খাসা দৈ-য়ে॥

নিধিরামের খতিয়ান

পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

রামনিধি মোক্তার
আহা কিবা শোক তার
প্রাণ সদা করে আইঢাই,
দেহখানা ভুঁড়িসার
পাঁচ হাতি ধুতি তার
টাকা ছাড়া কোন কথা নাই।
হুঁকা টানে ফুক্ ফুক্
কাশে সদা খুক্‌খুক্
হিসাব লেখার কি বাহার,
করে না তো রাম নাম
জপে সদা খতিয়ান
সুদ আছে বাকি কত কার।
সহসা সেদিন ঘটে
পড়ে মনে ঠিক বটে
তামাকটা সাজিবার কালে,
একখানা টিকা পড়ে
খতিয়ান ওঠে ধরে
আগুনটা বাড়ে তালে তালে।
শেষ কথা শোনো ভাই
মোটাসোটা বলে তাই
জনে জনে করে ডাকাডাকি,
কেহ কথা শোনে নাই
রামনিধি বলে তাই
—মরণের দিন কত বাকী!

পালোয়ান

বেলা দেবী

মাস্‌ল্ নাচিয়ে বলে ও পাড়ার পুষ্পক
বিষ্টু ঘোষের ক্লাবে করি ডনবৈঠক
রেগুলার আজ প্রায় সাড়ে চার বচ্ছর
দেখেছিস বাগিয়েছি চেহারা কি জব্বর!

'কেসিয়াস' এসেছিল মোর সাথে লড়তে
দুটি প্যাঁচ শুধু তার বাকি ছিল মরতে।
ল্যাজটি গুটিয়ে দিলে অ্যায়সা সে পিট্‌টান!
বিষ্টুদা সোল্লাসে মোর পিঠ চাপড়ান।

জনতা পড়লো ফেটে—সাবাস সাবাস রবে
আকাশ বাতাস মাটি কাঁপে মহা কলরবে।
সইলো না আর, নাড়ু বললে—এবার থাম্
পালোয়ান বলে আজও শুনিনি তো তোর নাম।

গৌরব-শিখরেতে পরে তুই চড়বি
আজ আয় মোর সাথে একহাত লড়বি।
উরুতে থাবড়া মেরে হাতে মুঠো বাগিয়ে
ইয়া তাগ্‌ড়াই নাড়ু যেই গেছে এগিয়ে

পায়ে পায়ে পিছু হটে পুষ্পক বললো
আরে আরে থাম্, তোর মাথা কেন চড়লো?
তুই যে বন্ধুলোক, তোর সাথে লড়বো?
না না ভাই, তার চেয়ে ভালো, নিজে মরবো।

এই বলে পুষ্পক দিল চোঁচোঁ পিট্‌টান
নাড়ু হেসে গড়াগড়ি—সা-ববা-স পালোয়ান॥

ফোটো তোলা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চুপটি করে দাঁড়াও দেখি তুলবো তোমার ছবি
চুলগুলো দাও ছড়িয়ে যাতে দেখায় কবি-কবি
চশমা যদি না থাকে ত খালি ফ্রেমটাই পরো
দুচারখানা বইখাতা আর কলম করো জড়ো...
ফুলদানিতে ফুলের তোড়া
রাখো না হয় দু এক জোড়া...
নড়ছো কেন? মশা কামড়ায় পায়ে?
বাব্বাঃ, যেন মূর্ছা যাচ্ছ ফুলের একটি ঘায়ে...

কী বললে? জলের তেষ্টা?
চেপে থাকবার করো চেষ্টা...
নাও হয়েছে, রেডি ত ঠিক
'সাটার' এখন করবে যে ক্লিক–
বলছো কি হে সেন্ট মাখবে ফোটোয় গন্ধ চাই?
এই ব্যাপারে এখন আমি কার উপদেশ পাই...
দাঁড়াও তবে, ফোটোয় গন্ধ যায় কিভাবে তোলা
সন্ধানে তার চষে বেড়াই টালা থেকে ঘোলা।

মোটর গাড়ির আদিকথা

এষা সিংহ

আজকালকার দিনে মনের খুশিতে পথে হাঁটবে—তার উপায় কই? এ দিকে গাড়ি, ও দিকে লরী, সে দিকে ট্রাম—সবাই মিলে পথের উপর কি ছোটাছুটিই লাগিয়েছে। পথ চলাই দায়। অথচ এরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এতই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে যে, এদের ছাড়া চলা আমরা যেন ভাবতেই পারি না। কিন্তু ভেবে দেখ, দূরের পথকে কাছে টানতে মোটর বা যন্ত্র বসিয়ে গাড়ি চালানোর কল্পনা মানুষের মাথায় আসে মোটে দুশো বছর আগে। তার আগে পর্যন্ত মানুষ পায়ে হেঁটে বা বড় জোর গরু, ঘোড়া, গাধা বা উটের টানা গাড়ি চড়েই পাড়ি দিতে জানতো। মোটর গাড়ির আরাম ও দ্রুতগতির কথা তারা ভাবতেই পারতো না।

এক দিনের হঠাৎ আবিষ্কারে মোটর গাড়ি তৈরী হয় নি। এর পিছনে আছে অনেক চতুর যন্ত্রীয় কারিগরী, বুদ্ধিমত্তা, অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ। অনেকেরই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় শেষ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতাই দিয়েছে নতুন পথের ইঙ্গিত—যার সূত্র ধরে হয়েছে নতুন আবিষ্কার। এইসব কল্পনা যাঁদের মাথায় প্রথম এসেছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাঁরা সফল হতে পারেন নি—তাঁদেরই কয়েক জনের প্রচেষ্টার তিনটি কৌতুকসরস অথচ করুণ কাহিনী আজ বলছি।

প্রথম যাঁর কথা বলছি তাঁর নাম জোসেফ কাগনট। জাতিতে ফরাসী, পেশায় সমর বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার।

বাষ্পের শক্তিকে দিয়ে আমরা যে কাজ আদায় করে নিতে পারি—মানুষ তখন সবে তা জেনেছে। সাভেরী, জেম্‌স্ ওয়াট, নিউকামেন্, এঁরা সব আবিষ্কার করেছেন বাষ্প দিয়ে চালানো এমন সব যন্ত্র, যা দিয়ে পাম্প করে জল তোলা যায়, আগে যা করানো হতো ঘোড়া দিয়ে। এর পরেই বুদ্ধিমানেরা ভাবতে আরম্ভ করলেন যে, তাহলে ঘোড়া দিয়ে টানা গাড়িতেও ঘোড়ার বদলে

যন্ত্র বসানো যায় কি ভাবে? যুদ্ধ-বিভাগের রকমারী ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ করতে করতে কাগনটের মাথায়ও এই চিন্তা খেলতে লাগল।

অবশেষে সত্যি তিনি একটি বাষ্পে চলা মোটর লাগানো গাড়ির মডেল তৈরি করে ফেললেন ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে এই রকম বড় মাপেরও একটি গাড়ি বানিয়ে ফেললেন, যা রাস্তা দিয়ে দিব্যি চলে যেতে পারে। এর তিনটি চাকার একটি রইল সামনে ও দুটি পিছনে। দুটি চোঙা দেওয়া বাষ্প-তৈরির একটি যন্ত্র এতে বসালেন। এর যোগ রইল সামনের চাকাটির সঙ্গে, যার ফলে বাষ্প প্রস্তুত হলেই সেই চাকাটি যাবে ঘুরে ও পিছনের চাকা দুটি ঘুরিয়ে দিয়ে গাড়িটি চালাতে থাকবে। এর বয়লারে যা বাষ্পের ব্যবস্থা রইল তাতে গাড়িটি মিনিট পনেরো দিব্যি চলতে পারবে। তার বেশী দরকার হলে গাড়ি থামিয়ে, আবার বাষ্প সংগ্রহ করে, নতুন করে গাড়ি চালিয়ে যাবার ব্যবস্থাও রইল।

ব্যাপারটা দেখে তখনকারের লোকে তো তাজ্জব। ফরাসী যুদ্ধ-মন্ত্রী ভাবলেন, এই রকম মোটর দিয়ে তাহলে তো ভারী কামানগুলোও যুদ্ধক্ষেত্রে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়? তখনকারের যুদ্ধে এ একটা খুব বড় কাজ ছিল কিনা। মন্ত্রী-মহাশয় তখনই গাড়ির পরীক্ষা নিতে চাইলেন।

প্যারিসের রাস্তায় কাগনট পরীক্ষা দিতে আনলেন তাঁর মোটর গাড়ি। রাস্তার দুধারে লোক। ঘন্টায় ১০ মাইল বেগে সুন্দর চলতে লাগলো তাঁর গাড়ি। মন্ত্রী-মহাশয় পরের যুদ্ধে এই রকম গাড়ি দিয়ে কামান টেনে নিয়ে শত্রুপক্ষকে কতখানি বিপর্যস্ত করবেন ভাবতে ভাবতে নিজের মনে গর্বিত হয়ে উঠছিলেন—হঠাৎ এক বিকট শব্দে চমকে উঠলেন। রাস্তার মোড় বেঁকতে গিয়ে গাড়ি কুপোকাৎ। ইঞ্জিনের খানিকটা ভাঙলো, কিছু লোক আহত হলো।

পরীক্ষা তো তখুনি বন্ধ হলো। গাড়িকেও আটক করা হলো—কাগনট যাতে এই ভয়ঙ্কর জিনিস নিয়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে না পারেন। কেউ কেউ বলেন, কাগনটকেও বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গাড়িটি নষ্ট করা হয় নি। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট নেপোলিয়ান আবার গাড়িটি পরীক্ষা করবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু তখনই নীলনদের যুদ্ধে তাঁকে রওনা হয়ে যেতে হলো। পরে আর কোন সুযোগই তিনি পেলেন না। সেই গাড়িটি এখনও রাখা আছে প্যারিসের একটি যাদুঘরে—তার পরীক্ষার জায়গার সামনেই।

কাগনটের পরে আর একজন উদ্ভাবক এই ধরনের গাড়ি চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নাম উইলিয়াম মারডক। ইনি জাতিতে স্কট। পেশা এঁরাও ইঞ্জিনীয়ারিং। ইনি যেখানে কাজ করতেন, সেই কারখানায় তৈরী হত বাষ্প-চালিত ছোট ছোট নানা ধরনের যন্ত্র। এগুলির ব্যবহার হতো খনিতে, নানা ধরনের কাজে।

নিজের কাজ করতে করতে মারডকের গাড়ি চালানোর যন্ত্রের কল্পনা মাথায় আসে। বাষ্প দিয়ে চালানো যন্ত্রের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিল প্রচুর। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সত্যি রাস্তা দিয়ে চলার উপযোগী একটি মোটর গাড়ী তৈরি করে ফেললেন। তাঁর গাড়ি অবশ্য ছিল খুবই ছোট। ১৯ ইঞ্চি লম্বা ও ১৪ ইঞ্চি উঁচু, খেলার গাড়ি বললেই হয়। এরও তিনটি চাকা। তামার তৈরী বয়লারে বাষ্প তৈরী হতো একটি স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনের সাহায্যে। বাষ্প বেশী হয়ে গেলে আবার সশব্দে বাইরে বেরিয়ে আসতো।

মারডক ভেবেছিলেন, কাউকে না জানিয়ে এর প্রাথমিক পরীক্ষাটা গোপনেই সেরে ফেলবেন। ঘরের মধ্যে গাড়ি ভালই চললো। অল্প কিছু জিনিসও টানতে পারলো। এবারে ভাবলেন, গির্জার প্রাঙ্গণের বাঁধানো রাস্তায় রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি চালিয়ে দেখবেন। রাতের বেলা কে আর ওখানে থাকবে?

যা ভাবা তাই কাজ। এক অন্ধকার রাত্রে সত্যি গাড়ি নিয়ে চলে এলেন তিনি। বয়লারের নীচে বাতি জ্বালিয়ে বাষ্পের ব্যবস্থা করতেই গাড়ি ছুটে চললো। লম্বা লম্বা পা ফেলে মালিকও ছুটলেন পিছু পিছু। কারুর ছোট্ট গাড়িতে তো মানুষ বসার জায়গা ছিল না। একটু পরেই তাঁর কানে এল আর্তরব—"বাঁচাও, বাঁচাও!" অসহায় করুণ আর্তনাদ। গীর্জার মাননীয় পাদ্রীমহোদয় কি দরকারে বেরিয়েছিলেন শহরের পথে। হঠাৎ দেখেন, ঝক্ ঝক্ আওয়াজ করতে করতে আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁরই দিকে ধেয়ে আসছে—সে কী এক অদ্ভুত বস্তু! এ কি কবরখানার কোনও দুষ্ট প্রেতাত্মা?

মারডক ছুটে এসে কোনও রকমে তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আশ্বস্ত করে আবার ছুটলেন তাঁর গাড়ির পিছনে। আর কাউকে 'ভূত দেখানোর' আগে কোন রকমে থামালেন গাড়িটা।

সেইখানেই মারডকের গাড়ি চালানোর খেয়ালের ইতি

হলো। অফিসের কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত করলেন। নিরুপায় মারডক দুঃখিত মনে মেনে নিলেন সেই নির্দেশ। আর কোন দিন তিনি সেই গাড়িটি স্পর্শ করেন নি। সেটা আজও বিলাতের এক যাদুঘরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।

আর এক স্কট ইঞ্জিনীয়ারের কথাও এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাম ক্যাপ্টেন রিচার্ড ট্রেভিথিক। তিনি কাজ করতেন খনিতে। তাঁর ছিল নতুন নতুন জিনিস তৈরি করার বাতিক। তিনি একবার একটি বাষ্পে চলা গাড়ি তৈরি করে ফেললেন। উঁচু লম্বা বয়লার, চিমনী ইত্যাদি বসিয়ে বেশ ভালই জিনিসটি তৈরি করলেন। সবচেয়ে সুবিধা হলো—তাতে ছিল ছ'জন লোকের বসবার জায়গা।

১৮০১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর শুরু হলো পরীক্ষা। পাহাড়ের উঁচু চড়াইয়ের পথে সেই গাড়ি চমৎকার ভাবে চলে গেল। যেখানে ঘোড়ার গাড়ি যেতে হিমসিম খেত, সেই দুর্গম পথে এই গাড়ি চলে গেল স্বচ্ছন্দ গতিতে। দেখে সকলে তো অবাক।

পরের দুদিনও ট্রেভিথিক তাঁর গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। ২৮শে ডিসেম্বর কয়েক জন বন্ধুকে নিয়ে তিনি বের হলেন। পথে পড়ল এক নালা। সেটা পার হতে গিয়ে ড্রাইভারের হাত থেকে স্টিয়ারিং হুইল গেল ছিটকে বেরিয়ে। গাড়ি গেল উল্টে। ভাগ্যক্রমে আরোহীরা সকলে অক্ষতই রইলেন। সবাই মিলে গাড়িখানি সোজা করে তুলে রেখে, ঢুকলেন গিয়ে সামনের এক সরাইখানায়—একটু গলা ভিজিয়ে বিশ্রাম করে নিতে।

গল্পে-কথায় একটি জিনিস তাঁরা এক দম ভুলে গিয়েছিলেন। ইঞ্জিনের আগুনটি যে নেভানো হয়নি—তা কারুরই খেয়াল ছিল না। বয়লারের জলটুকু গরম হয়ে ফুটে ফুটে শুকিয়ে গেলে, লোহার মোটর তেতে লাল হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অবশ্য কেউ কেউ অন্য কথাও বলেন। ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানরা তাদের ব্যবসায়ে বিপদ আশংকা করে নাকি ইচ্ছা করেই গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ঠিক কোন্‌টা সত্যি, আজ আর জানার উপায় নেই।

ট্রেভিথিক অবশ্য এতে দমেন নি। পরের বছর আবার তিনি একটি গাড়ি তৈরি করে ফেলেন ও লণ্ডনে দেখাতে আনেন। নব্বই মাইল পথ এটিকে তিনি চালিয়ে নিয়ে আসেন। যাত্রী বসার জন্য ভাল ব্যবস্থাও এতে ছিল। কিন্তু লণ্ডনের পরীক্ষায় ইঞ্জিন তেমন ভাল চললো না। জনাকীর্ণ পথের পক্ষে সে গাড়ি অনুপযোগী বলেই বিচারকরা রায় দিলেন।

ট্রেভিথিক ক্ষুণ্ণ মনে লণ্ডন থেকে বিদায় নিলেন। চলে গেলেন সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায়। পরে অবশ্য আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। জীবনের শেষ দিনগুলি তাঁর কাটে অতি দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে।

কাহিনী তিনটি পড়লেই বোঝা যাবে যে, প্রথম যুগের মোটর গাড়ি বাষ্পের সাহায্যেই চালাতে চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে বাষ্পীয় শকট বা রেল গাড়িরও সূচনা হয়েছিল সেই ভাবে। কিভাবে লাইন পেতে রেল গাড়ি চললো বা পেট্রোলে চলা মোটর গাড়ি কিভাবে পথে ছুটলো, সে গল্প পরের জন্য থাক।

ইংরাজী রচনা অবলম্বনে

যন্ত্র-মানব রোবট

—সুনীল সরকার

তোমরা বোধ হয় জান, এটা ইলেকট্রনিক যুগ। এ যুগের যা কিছু বিস্ময় সবই বোধ হয় ইলেকট্রনের জন্যেই সম্ভব হচ্ছে। সম্ভব হচ্ছে যন্ত্র-মানব তৈরী করা। এই সব ইলেকট্রনিক বা যন্ত্র-মানব, মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানাতে পারে। এমনি একটি যান্ত্রিক মানুষ 'রোবট' তৈরী করেছেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। এটি মানুষের মতই নিজের চরিত্র সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা রোবটকে প্রথমে শিখিয়ে তারপর তাকে প্রশ্ন করেন আপন গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ করতে। তাঁদের প্রশ্ন রাখার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক ব্রেন কাজ করতে আরম্ভ করে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজের দোষ ও গুণ ওজন করে লিখিতভাবে জবাব দেয়। উত্তরে যন্ত্রটি বাস্তবতার পরিচয় দেয়। কখনই আজে বাজে বলে না। শুধু তাই নয়—এটি তোমার আমার চারিত্রিক দোষ-ত্রুটীও বলে দিতে পারে। দিনে আমরা ক'টা মিথ্যে কথা বলি তাও বলে দিতে পারে। কি সাংঘাতিক—সব গোপন ফাঁস!

কুমীর, ভুঁড়োশেয়ালী আর শেয়ালপণ্ডিত

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সেই যে বোকা কুমীর, যার সাত-সাতটা বাচ্চাকে শেয়ালপণ্ডিত একের পর এক নিজের পেটে পাঠিয়েছিল, তার সাথে এক ভুঁড়োশেয়ালীর দেখা হলো নদীর পাড়ের বাঁশবনে। প্রকাণ্ড সেই বাঁশবন। কোথায় যে তার শুরু আর কোথায় যে তার শেষ, না শেয়ালী, না কুমীর কেউ তা পারে বলতে।

শেয়ালীকে দেখেই কুমীরের মেজাজ যেন আগুন! ভাবলো, এ-ই সেই পণ্ডিত। তারই মতো কত মাকেই না কাঁদিয়ে ভুঁড়িটা বাগিয়েছে এমন—শরীরখানা করেছে নাদুসনুদুস! কুমীরের দাঁত সুড়সুড় করতে লাগলো। কিন্তু এখনই যদি দাঁত বার করে ওকে তেড়ে যায়, তাহলে ওকে আর ধরা যাবে না কস্মিনকালেও। তাই চালাকি করতে হবে। এই ভেবে ভালো মানুষটির মতো দু হাত তুলে সে বললো ঃ এই যে পণ্ডিতমশাই, নমস্কার। খবর কী?

ভুঁড়োশেয়ালী খিঁক খিঁক করে হাসলো।

ঃ হাসচো যে, হাসচো যে!—রেগে গেল কুমীর।

ঃ তুমি বোকা কি না, তাই।

ঃ আমি বোকা! আর তুমি খুব বুদ্ধিমান, না?—খুব রেগে গেল সে ঃ আচ্ছা, দেখি কেমন বুদ্ধিমান তুমি। বলো দেখি, বলো দেখি, শুভঙ্করের ফাঁকি, তেত্রিশ থেকে তিনশ' গেলে কত থাকে বাকী?

শেয়ালীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল। সাদা গোঁফ-জোড়া চুমরে চুমরে অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বললো ঃ তা, তা অনেক হবে।

ওর অবস্থা দেখে কুমীর তো মহা খুশী ঃ অনেক তো বটে! কত হয়, বলো।

ঃ দশগণ্ডা, বিশগণ্ডা হবে।

হো হো করে হেসে উঠলো কুমীর। ঝকঝকে দাঁতগুলো ঝকমক করে উঠলো রোদ্দুরে ঃ এই তোমার বুদ্ধি! এই নিয়েই করো পণ্ডিতি!

ঃ বারে, আমি পণ্ডিতি করি নাকি, সে তো করে আমার খুড়তুতো দাদা! আর ওসব আমি কোনো দিন পড়েছি নাকি? আমার নাতি-নাতনিগুলো পড়ে হয়তো। আমি যা ভালো করে শিখেছি, তা জিজ্ঞেস করো দেখি!

ঃ কী শিখেছ—কর খল চল?

ঃ তা, তা কিছু পড়েছি। কলস, জলধর, দশরথ বানান জিজ্ঞেস করলেও পারবো। কিন্তু ওগুলো তো আমার পড়ার বিষয় নয়, আমার পড়া অন্য।

ঃ কী তোমার পড়া?

ঃ এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার...

ডাইনে ঘোরো ভাই, বাঁয়ে দুই ধাপ,

বন্ বন্ করে ঘোরো, দাও তিন লাফ।...

ঃ ওগুলো আবার কোন্ কেলাসের পড়া?—কুমীরের চোখ ছানাবড়া।

ঃ নিত্য, নিত্যের কেলাসের। হেঁ হেঁ—কী, তোমার জানা আছে?

চোখ পিট পিট করতে লাগলো কুমীর ঃ তা কি কি বই পড়া হয় সেখানে?

ঃ বই! বই দিয়ে কী হবে?

ঃ তা, বই পড়া হয় না?

ঃ ওমা, বই পড়তে হবে কোন্ দুঃখে! ও তো শুধু হাত-পা-শরীর নাচানো। তবে 'বই পড়া' বলে একটা নাচও আমার জানা আছে বটে, সেটা 'বসা নাচ'। খু-ব সোজা। কোথাও আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সামনে-পেছনে দুলতে থাকো, দুলতে থাকো.....এইভাবে এইভাবে...—বলে 'বই-পড়া নাচ' দেখাতে থাকে শেয়ালী।

এতক্ষণে বুঝলো কুমীর, শেয়ালীর পড়া-শোনা কিছুই নেই। কেবল লাফাতে পারে, তাকেই বলে নাচ, তাকেই বলছে নিত্য মানে নৃত্য।

ঃ ধুর্ ধুর্, ওটা আবার একটা পড়া নাকি!—নাক সিঁটকালো কুমীর ঃ ও তো বাঁদরের বাচ্চাও পারে।

ঃ পারে!—ভুঁড়োশেয়ালীর গোঁফ রাগে খাড়া হয়ে উঠলো ঃ তুমি পারবে? 'ঘুরঘুর' নাচটাই পারবে তুমি? পারবে 'একপদনিত্য'—এক পায়ে দাঁড়িয়ে বন্ বন্ করে ঘোরা, পর পর সাত পাক ডাইনে, সাত পাক বাঁয়ে?...

ঃ খুব পারবো।

ঃ পারবে? তোমার মাথা পারবে! চোদ্দ জন্ম ধরে চেষ্টা করলেও হবে না।

ঃ কী বললি, পারবো না? দেখবি?

ঃ বেশ তো, দেখাও না চাঁদ।

এর মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় রটে গেছেঃ কুমীর এসেছে, কুমীর এসেছে! খেঁকশেয়ালের পাড়া, হুক্কু-শেয়ালের পাড়া, নেকড়ে বনবেড়ালের পাড়া উজাড় করে সব এসে জড়ো হয়ে গেছে। বাঁশের মাথায় মাথায় বদমেজাজী মুখপোড়া হনুমানের দল—এন্তার গাল দিয়ে চলেছে কুমীর আর ভুঁড়োশেয়ালীকে। দেখতে দেখতে দুজনের চারদিকে জন্তুজানোয়ারের মেলা বসে গেল।

অনেকবার ঠকেছে কুমীর এর কাছে না হোক, এর দাদা শেয়ালপণ্ডিতের হাতে। আখের চাষ করতে গিয়ে, মূলোর চাষ করতে গিয়ে.....এমনি কতোবার! সব জায়গায় সে ঠকেছে। ঠকে ঠকে শিখেছে, অত তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলা উচিত নয়। তাই সে ভুঁড়োশেয়ালীকে বললে ঃ ঠিক আছে দেখাচ্ছি। কিন্তু হ্যাঁ রে ভুঁড়িউলী, সাদা গুঁফো বুড়ি থুত্থুরি, তুই-ই কি পারিস ঐ একপদনৃত্য, না কি ছাই নৃত্য?

ঃ পারিই তো, পারিই তো...কত্তো নেচেছি, কতজনাকে শিখিয়েছি। এই যে এরা, এদের অনেকেই আমার ছাত্তোর।

ঃ বেশ তো, তা-ই যদি হয়, নাচ না—নেচে দেখা না সত্যি সত্যি বলছিস।

ঃ বেশ, দেখাচ্ছি। কিন্তু বিচার করবে কে? কে বলবে কারটা ঠিক হচ্ছে?

কুমীর বললো ঃ বিচারের কোনো দরকার নেই, ও এমনিতেই বোঝা যাবে।

ভুঁড়োশেয়ালী চেঁচিয়ে উঠলোঃ না না, তা হবে না, তা হবে না—বলে যারা সেখানে ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে ডাকলোঃ আপনাদের কে বিচারক হবেন এই নিত্যসভার, কে উপযুক্ত বিচার করতে পারবেন, আসুন দয়া করে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজনকে উঠতে দেখা গেল। মাথায় বাঁদুরে টুপি, কাঁধে পাটকরা রেশমি চাদর, চোখে চশমা, বাঁ হাতে ধরা ধুতির কোঁচা, ডান হাতে ছড়ি। মুখটা ঠিক বোঝা গেল না। একজন বুদ্ধিমান পাতিশেয়াল তাড়াতাড়ি কোত্থেকে একটা চেয়ার জোগাড় করে এনে রাখলো বিচারকের পেছনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনাচার নেকড়ে মিলে নিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা টেবিল। তার উপর একখানা ফরসা চাদর বিছিয়ে দিল এক খেঁকশেয়াল। সব দেখে শুনে বাঁশবনের দোল-খাওয়া একটা হনুমান দুহাত ভরে নিয়ে এল জুঁই, বেলা আর কনকচাঁপা, বিছিয়ে দিল টেবিলের উপর। দর্শকের সংখ্যা বেড়ে গেল, বাড়তে লাগলো গণ্ডগোল। বাঁদুরে টুপি মাথায় সভাপতি একমুঠো বেল ফুলের গন্ধ নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেনঃ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, এখনই বিচারসভা অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা ধৈর্য ধরুন, নইলে অত্যন্ত অসুবিধা হবে।

গলার স্বরটা কুমীরের কেমন চেনা-চেনা লাগলো। কিন্তু ঠিক ধরতে পারলো না, ভদ্রোলোকটি কে। গণ্ডগোল থেমে গেল। ওদিকে ভুঁড়োশেয়ালী একটুকরো লাল সালু দিয়ে ভুঁড়িটাকে সামলে নিল; একটা ঘাগরা পরলো; নীল রঙের একফালি কাপড় দিয়ে ফেট্টি বাঁধলো কপালে; মাথায় পরলো একটা কনকচাঁপা।

তারপর লাল টুকটুকে পাতলা একটা ওড়না গায়ে জড়িয়ে একেবারে তৈরী হয়ে রইলো নাচের জন্য।

বিচারক বসেছিলেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেনঃ উপস্থিত সম্ভ্রান্ত দর্শকবৃন্দ! সর্বপ্রথমে শ্রীমতী ভুঁড়োশেয়ালী তাঁর নৃত্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন।

বলামাত্রই ভুঁড়োশেয়ালী নাচ শুরু করে দিল একটা উঁচু ঢিবির উপর। উঃ, সে কী নাচ! বন্ বন্ করে ঘুরছে ডাইনে বাঁয়ে, বাঁয়ে ডাইনে। এত জোরে ঘুরছে, মনে হচ্ছে, একটা লাল রঙের চাকা ঘুরছে বন্ বন্ করে।

এমন সময় কা-কা করে উঠলো একটা কাক। কুমীর যে শিমুল গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দেখছিল, তারই এক ডালে। বিরক্ত হলো কুমীর—কোথাকার আপদ!

কাকটা আরও একবার ডাকলো। কিন্তু কুমীর দৃক্-পাতই করলো না। তখন কাকটা উড়ে এসে পড়লো ওর পিঠের উপরে। পড়েই 'ক, ক-অ' করে বললেঃ কুমীরদা, আবারও ঠকতে চাও নাকি?

কুমীরের একটু চেনা-চেনা মনে হলো গলার স্বর। ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো, এ-ই সেই কাক, যার মুখ থেকে শেয়াল মিথ্যে প্রশংসা শুনিয়ে মাংসের টুকরো নিয়েছিল কেড়ে। কুমীর বললোঃ কিন্তু কী করি বলো, ভাই, উপায় তো দেখছি না!

কিছুক্ষণ ঘাড় কাত করে কাক কি দেখলো, তারপর বললোঃ দাঁড়াও কুমীরদা, কিচ্ছু ভেব না, আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।—বলেই সে উড়ে গেল।

ভুঁড়োশেয়ালীর নাচ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় হকচকিয়ে গেল সবাই। দুটো বাচ্চা খেঁকশেয়াল তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। তার-পরেই পাঁচ-ছটা ধেড়ে শেয়াল...তারপরে গণ্ডগোল, হৈ হৈ বিশ্রী চীৎকার। বিচারক গলা চড়িয়ে বলতে থাকেনঃ আপনারা শান্ত হোন, যাবেন না, যাবেন না, ভয়ের কোনো কারণ নেই...

কিন্তু এক-এক করে সব পালাতে থাকে। এমন সময় একটি পাতিশেয়াল এসে বিচারকের কানের কাছে কি বলতেই বিচারকও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই সময় আবার ট্যাঁ ট্যাঁ করে একটা গাঙ্‌শালিক বিচার সভার উপরে উড়তে লাগলো ঘুরে ঘুরে। ঘুরতে ঘুরতেই বললোঃ কুকুর, কুকুর আসছে, শহর থেকে ছুটে আসছে পাঁচশ' কুকুর! এইমাত্র দেখে এলাম, সাবধান, সাবধান...

দেখতে দেখতে জায়গা একেবারে ফাঁকা। ভুঁড়ো-শেয়ালীও রইল না সেখানে। কুমীর অবাক হলো। কিন্তু খুশীও হলো—ভুঁড়োশেয়ালীর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে তো। খুশীমনে সে তার লেজটা বারকয় এদিক ওদিক আছড়াল। ঠিক এমনি সময়ে আবার সেই কাকটা কা-কা করে উড়ে এসে বসলো তার পিঠে। তারপর এক্কা-দোক্কা খেলার মতো তিন ধাপে কুমীরের কানের কাছে গিয়ে নীচুস্বরে বললোঃ কী গো কুমীরদা, চুপচাপ বসে আছে সে! শেয়ালপণ্ডিতকে পাকড়াবে না?

ঃ শেয়ালপণ্ডিত! কোথায় শেয়ালপণ্ডিত?

ঃ কেন, ঐ যে বাঁদুরে টুপি মাথায় সভাপতি, এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগুচ্ছে পায়ে পায়ে।

অ্যাঁ, তা-ই নাকি!—কুমীরের সারা শরীরের কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে উঠলো। আর একটি কথাও না বলে, বেঁটে বেঁটে পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল শেয়ালের দিকে। কিন্তু পণ্ডিতও ব্যাপারটা বুঝে বেশ তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছে ততক্ষণে।

কিন্তু তা-ও সে এগুতে পারলো না বেশী দূরে। একটু পরেই সমস্ত বাঁশবনে ঝড় তুলে যত রাজ্যের কাকেরা এল আকাশ কালো করে। ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা শেয়ালের ওপর। দেখতে দেখতে পণ্ডিতের পোশাক-আশাক ভড়ং-ভাড়ং টুকরো টুকরো! ঠুকরে ঠুকরে কাকগুলো ওর শরীরটা রক্তাক্ত করে তুললো। তার করুণ কান্নায় সারা বাঁশবন উঠলো কেঁপে কেঁপে।

কুমীরও এর মধ্যে ঝকঝকে ধারালো দাঁত বাগিয়ে এসে পড়েছেঃ ছেড়ে দাও তোমরা, আমিই এটাকে খতম করে দি।

কতকগুলো কাক আকাশে উঠে পথ করে দিল কুমীরকে আর কুমীরও এগিয়ে এসে খ্যাঁক্ করে কামড়ে ধরলো শেয়ালপণ্ডিতকে।

কিন্তু রাগের সময় ভালো করে কি দেখা যায় চোখে? কুমীর ভেবেছিল, শেয়ালপণ্ডিতের একখানা ঠ্যাং-ই বুঝি বা কামড়ে ধরেছে। কিন্তু আসলে কামড়টা পড়েছিল ওর মোটা ফুলো-ফুলো পশমী লেজে। আর সে কামড় এমনই কামড়, সঙ্গে সঙ্গে লেজটা আলাদা হয়ে গেল শরীর থেকে।

শেয়াল কিন্তু সে-লেজের মায়া করলো না।। মরিয়া হয়ে ছুট লাগালো সঙ্গে সঙ্গেই। সারা শরীর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে, দিগ্‌বিদিক্ হারিয়ে যেদিকে ফাঁক পাচ্ছে সেদিকে ছুটছে শেয়াল আর পেছন পেছন তাড়া করে চলেছে কাকগুলো।

কিন্তু কুমীর পড়লো মুশকিলে। শেয়ালের মোটা পশমী লেজটা এখনও পড়ে রয়েছে সামনে। সেটা ছটফট করছে এখনও। কী করবে সে এটাকে নিয়ে?

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের **ডমরু-চরিত** অবলম্বনে • শিল্পী ঃ শৈল চক্রবর্তী

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

বটে! তুই আমি সেজে আমার সর্বস্ব ভোগ করবি! দাঁড়া —

ডমরু সন্ন্যাসীর গলা টিপে ধরল কিন্তু দুর্বল বৃদ্ধের দেহে আর শক্তি কত?

এইবার! তুমি ভাবছ তোমার চাকর তোমায় সাহায্য করবে! হাঃ হাঃ হাঃ.... তুমি যে ডমরু তা কেউ বিশ্বাস করবে না! যাও —

এই বলে সাধু ডমরুকে এমন জোরে ঠেলে দিল যে সে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

যদি নিজের ভাল চাও, তা'হলে চুপ চাপ আমার শিষ্যদের সঙ্গে চলে যাও আমার সেই পুরনো আস্তানায়। যদি না যাও, তাহলে তোমার সমূহ বিপদ হবে!

[চলবে]

মহাকাল রায়

৩রা ডিসেম্বরঃ

পরাধীন ভারত। শাসক ইংরাজ সারা দেশকে বেঁধে রেখেছে শাসন ও শোষণের শিকলে। কিন্তু স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচতে চায়! দিকে দিকে ভারতবাসী তাই জাগছে। তারা স্বাধীনতা চায়। সবচেয়ে জোরদার আন্দোলনে মেতেছে বাঙলা দেশ। ইংরাজ ভয় করে বাঙলাদেশ ও বাঙালীকে। তাই বুঝি বাঙলাদেশকে কাটছাঁট করে, ভেঙে টুকরো করে বাঙালীর ঐক্যকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য শাসক ইংরাজের এত ষড়যন্ত্র! এনড্রু ফ্রেজার তখন বাঙলাদেশের ছোটলাট। বঙ্গভঙ্গের প্রথম পরিকল্পনা তৈরি করলেন ফ্রেজারসাহেব। চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা আর ময়মনসিংহ জেলাকে যোগ করে দেওয়া হবে আসামের সঙ্গে। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের প্রথম পর্যায়ের এই পরিকল্পনা সরকারী সমর্থন লাভ করল। বাঙালীর জাতীয় ঐক্যে সেদিন প্রথম আঘাত হানবার চেষ্টা করল ইংরাজ শাসকদল।

৪ঠা ডিসেম্বরঃ

এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির দর্শনের ক্লাস চলছে। অনেক ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন একজন শান্ত-দর্শন যুবক। দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়ে পাদরী হবেন, এই তাঁর বাবা-মার ইচ্ছা। কিন্তু ছাত্রটি অন্যমনস্ক। এই শুকনো পড়াশুনা করতে, পরীক্ষায় বসতে তাঁর ইচ্ছা করে না। শেষ পর্যন্ত তাই ছেড়ে দিলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা। কিছু দিন অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন, কিন্তু ভাল লাগল না। এবার প্রবন্ধ লেখায় মন দিলেন। শুরু করলেন রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে। জার্মান দার্শনিক কান্টের তিনি ভাব-শিষ্য। মহাকবি গ্যেটের প্রভাবে বিমুগ্ধ-আত্মা। গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডের জনক অলিভার ক্রমওয়েলের চিঠি আর বক্তৃতার সংকলন সম্পাদন করলেন তিনি। লিখলেন ফেডারিক দি গ্রেটের ইতিবৃত্ত। ফায়ার-প্লেসের আগুনে পিঠ রেখে তিনি চিন্তা করতেন আর লিখতেন প্রচুর। বিষয় বৈচিত্র্য এবং সাবলীলতার গুণে ইংরাজ শিক্ষিত-সমাজ তাঁকে অনতিবিলম্বে স্বীকার করে নিলেন। ফরাসী বিপ্লবীদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর দরদ। ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত লিখলেন তিনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এই শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হচ্ছেন টমাস কার্লাইল (জন্ম ঃ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৫ সাল। মৃত্যু ঃ ১৮৮১ সাল।)

৬ই ডিসেম্বরঃ

ঊনবিংশ শতাব্দী। বাঙলার জাগরণের কাল। একের পর এক বাঙালী চিন্তানায়কের আবির্ভাবে বাঙালার সাংস্কৃতিক আকাশ উজ্জ্বল। সমাজ-সংস্কারক শিক্ষা-প্রচারক, কাব্য-সাহিত্যের স্রষ্টাদের কর্ম-চাঞ্চল্যে তখন মুখর বাঙলার অঙ্গন। গদ্যসাহিত্য ও উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র তখন মধ্যগগনে। ঠিক সেই সময় আর একজন সংস্কৃত-ভাষার পণ্ডিত বাঙলা রচনায় হাত দিলেন। আরও সহজ ভাষায় লিখলেন বাঙলার গল্প। এককালের বাণিজ্য-অনুরাগী বাঙালীর সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা করলেন তাঁর রচনায়। বাঙালীকে শোনালেন কাঞ্চনমালার গল্প। হাজার বছরের বাঙলা ভাষায় যেসব বৌদ্ধ দোঁহা ও গান লেখা হয়েছিল, সেগুলো আবিষ্কার করলেন। ইনিই পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরে ১৮৫৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি খুব মেধাবী ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স ও এফ-এ পরীক্ষা দেন ও কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। বি-এ এবং এম-এ পাশ করার পর তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। বহু মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর।

৮ই ডিসেম্বরঃ

১৯৩০ সাল শেষ হতে চলেছে। কর্মচঞ্চল ডালহৌসি এলাকা। সরকারী দফতরখানা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কেরানী-বেয়ারা-সেক্রেটারী সবাই কাজে ব্যস্ত। সারা দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার চলেছে, শত শত সত্যাগ্রহী বন্দী হয়েছেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে লাঠি চার্জ করে সুভাষচন্দ্রসহ কয়েকজনকে আহত করা হয়েছে। তাই বিপ্লবী বাঙালী যুবকরা শাসক ইংরাজদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একদিকে ইংরাজ শাসকদলের ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার, অন্যদিকে মুক্তিকামী তরুণদের প্রতিশোধ নেবার গোপন প্রস্তুতি।

সেদিন ৮ই ডিসেম্বর। বেলা বারোটা। সাহেবী-পোশাক-পরা তিনজন বাঙালী যুবক রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলেন। কেউ তাঁদের চিনতে পারে নি। তাই কেউ বাধাও দেয় নি। কয়েক মিনিট পরেই তাঁদের হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল লোম্যান গুলিতে প্রাণ দিল। নিহত হল কারাবিভাগের অত্যাচারী ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল সিম্পসন। খবর ছড়িয়ে পড়ল। ছুটে এল রক্তলোভী নিষ্ঠুর পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট পুলিসবাহিনী নিয়ে। এল সামরিক বাহিনী। সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তিনজন অসমসাহসিক বাঙালী তরুণ পুলিস আর সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করলেন। গুলিতে প্রাণ দিলেন বিনয় বসু। রিভলবারের গুলি ফুরিয়ে যেতে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন বাদল গুপ্ত। আর আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন এবং পরে ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন দীনেশ গুপ্ত। তিন অমর শহীদের এই 'অলিন্দ-যুদ্ধ' বাঙালীর বিপ্লবের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

১৩ই ডিসেম্বর

মজঃফরপুর আদালতের সাহেব বিচারক জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তোমার মনে কোনরূপ ভয় আছে কি?' আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন একজন নির্ভীক বাঙালী তরুণ। জবাব দিলেনঃ 'কেন ভয় করব?' অবাক হয়ে বিচারক তাকিয়ে রইলেন ক্ষণকাল, হয়ত মনে মনে ভাবলেনঃ মরতে যে ভয় পায় না, সে-ই ত মৃত্যুঞ্জয়ী! ইনিই সেই তরুণ বিপ্লবী বাঙলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। ১৮৮৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনেই সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদান করেন। অত্যাচারী ইংরাজ সিবিলিয়ান কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য দল থেকে ক্ষুদিরামকে পাঠান হয়েছিল মজঃফরপুরে। তাঁর সঙ্গী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। কিন্তু কিংসফোর্ড বেঁচে গেল, আর বোমার আঘাতে নিহত হলেন দুজন ইংরেজ মহিলা।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। তাঁর বিচার হল। ১৯০৬ সালের ১১ই অগস্ট মজঃফরপুর জেলখানায় তাঁর ফাঁসি হল। সেদিন বাঙালী যুবকরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই দুঃসাহসিক পথই গ্রহণ করেছিলেন।

১৪ই ডিসেম্বর

বরফ আর বরফ—সাদা পুরু জমাট বরফের আস্তরণ, স্তূপ আর পাহাড়-পর্বত চারিদিকে।

এই বরফের মধ্যে তাঁবু ফেলেছেন একদল মানুষ—দুরন্ত দুঃসাহসী অভিযানকারীর দল। যে-পথে কেউ কোনদিন হাঁটে নি, যে-পথে চলতে অতি বড় দুঃসাহসীরও বুক কাঁপে, সেই নির্জন ভয়ংকর বরফ-প্রান্তর পার হয়ে এসেছেন ওঁরা। আজ এসে পৌঁছেছেন দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রবিন্দুতে। সেটা ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর।

দলের নেতা নরওয়ের দুর্ধর্ষ নাবিক ক্যাপ্টেন রোনাল্ড আমুণ্ডসেন।

উত্তর মেরু জয় করার জন্য যাত্রা করেছিলেন আমুণ্ডসেন। কিন্তু সহসা অভিযানের দিক বদল করে জাহাজের মুখ ঘোরালেন দক্ষিণ মেরুর দিকে। হোয়েল উপসাগর পার হয়ে নামলেন দক্ষিণ মেরুর বিশাল বরফ-প্রান্তরে। সঙ্গে কুকুরটানা শ্লেজ গাড়ী আর স্কি। অবশেষে চার শ মাইল বরফ-প্রান্তর পার হয়ে দক্ষিণ মেরু বিজয়ী হলেন আমুণ্ডসেন।

১৬ই ডিসেম্বর

ইতালীর নেপল্‌স্‌ উপসাগরের কাছে এক মস্ত উঁচু পাহাড়। নীচে সাজান গ্রামের পর গ্রাম। সর্বত্র শান্ত পরিবেশ। যে যার কাজ করে চলেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল, ঐ পাহাড়টার মাথা থেকে কিছুকাল যাবৎ অনর্গল ধোঁয়া উঠছে। পাহাড়টা একটা আগ্নেয়-গিরি, নাম বিসুবিয়াস। বিসুবিয়াসের মাথা থেকে অমনি ধোঁয়া ওঠে মাঝে মাঝে কিছুকাল অন্তর। তাই

আগ্নেয়গিরির তলায় বাস করেও গ্রামগুলোর বাসিন্দারা বিসুবিয়াসকে ভয় করে না,—এ ধোঁয়া তাদের গা-সহা হয়ে গেছে।

১৬৩১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সহসা প্রচণ্ড আওয়াজে গ্রামের অধিবাসীরা সচকিত হয়ে উঠল। সর্বনাশ! বিসুবিয়াসের মাথা থেকে অগ্নিময় গলিত লাভা-স্রোত বেরিয়ে আসছে! পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে বিপুল সে লাভা-স্রোত! দেখতে দেখতে তা ঢেকে ফেলল গ্রামগুলো। পালাবার পথ নেই। উদ্ধারের আশা নেই। বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে সেদিন হাজার হাজার নর-নারী প্রাণ দিল।

২১শে ডিসেম্বর

আজ থেকে নব্বই বছর আগে। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জর্জিয়ার গোরি শহরের উপকণ্ঠে অতি নোংরা কদর্য এক বস্তি এলাকা—মুচী, মেথর, কুলিমজুরদের বাস। রোগেশোকে, অশিক্ষাকুশিক্ষায় আর চূড়ান্ত অভাবের জ্বালায় গোটা এলাকা ধুঁকছে সবসময়। সেখানে অতিগরিব এক মুচীর নোংরা জরাজীর্ণ বস্তি-ঘরে ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর একটি ছেলে জন্ম-গ্রহণ করে। ছেলের নাম রাখা হল জোসেফ ভিস্যারিয়নোভিচ জুগ্যাসভিলি। মা আদর করে ডাকেন সোসো। সবাই ভাবে, মুচীর ছেলে সোসো মুচীই হবে। কিন্তু মা বলেন—না, সোসো লেখাপড়া শিখবে, পাদরী হবে। ছেলেকে মানুষ করার জন্য মায়ের সে কী প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম! মায়ের সে চেষ্টা ও পরিশ্রম কিন্তু ব্যর্থ হল না।

জার সম্রাটের অবিচার, শোষণ ও অত্যাচারে রাশিয়ার জনসাধারণ তখন পশুর মতো বাস করছে, মরছে শেয়ালকুকুরের মতো। নিঃস্ব গরিবের সন্তান সোসো বুঝলেন, জারের শাসন ধ্বংস না করলে মানুষের নিস্তার নেই। তাই পনের বছর বয়সেই সোসো বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। তাঁর ওপর নেমে এল জারের পুলিসের অকথ্য নির্মম অত্যাচার। পুলিস তাঁকে যে কতবার জেলে ও নির্বাসনে পাঠিয়েছে ও তাঁর ওপর নির্মম দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সে এক রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর ইতিহাস—অতি রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাকাহিনীর চেয়েও চিত্তাকর্ষক। তারপর ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিক বা কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হল, জারতন্ত্র ধ্বংস হল, রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল সমাজতান্ত্রিক শাসন—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। সোসো গোড়া থেকেই ছিলেন লেনিনের অতিপ্রিয় বিশ্বস্ত মন্ত্রশিষ্য এবং বিপ্লবের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনা-ভার তাঁকেই গ্রহণ করতে হল। মুচীর ছেলে সোসো মুচী হলেন না, পাদরী হলেন না, হলেন কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের নেতা ও পরিচালক। কিন্তু তখন তাঁর নাম আর সোসো নেই বা বাপমায়ের দেওয়া পোশাকী নামও নেই। গুপ্ত বিপ্লবী কাজের সময় যে ছদ্মনাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেই নামেই তখন তিনি পরিচিত পৃথিবীর কাছে। সেই নামটি হল জোসেফ স্টালিন। ১৯৫৩ সালের ৬ই মার্চ স্টালিনের মৃত্যু হয়।

২৫শে ডিসেম্বরঃ

দিদিমার আদুরে নাতি।

বাড়ীর কাছে ছিল একটা গম-ভাঙানর কল। সেই কলটা দেখে এসে ছেলেটি কাঠ আর লোহার টুকরো দিয়ে একটা ক্ষুদে গম-ভাঙানর কল তৈরি করল। পাড়াপড়শী সবাই অবাক। কেউ কেউ দিদিমাকে বলল —তোমার নাতি বড় হয়ে ভাল কারিগর হবে।

নাতি কিন্তু বড় হয়ে হলেন খুব বড় বিজ্ঞানী।

গ্যালিলিও সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদির ভিতরকার সম্পর্কের কথা শুনিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে। কিন্তু সম্পর্কের সূত্রটা যে কি, তা তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। বলতে পারেন নি, কোন্ অদৃশ্য শক্তির বাঁধনে ওরা বাঁধা আছে। কেন ওরা পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে যাচ্ছে না? বাগানে বসে বসে এই কথাই ভাবছিলেন দিদিমার সেই নাতিটি, এখন তিনি বয়সে তরুণ—বিজ্ঞানী। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গাছ থেকে একটা আপেল মাটিতে পড়ল। কেন আপেলটা মাটিতে পড়ল? শূন্যেও ত উড়ে যেতে পারত? ভাবতে ভাবতে তরুণ বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন সেই অদৃশ্য বন্ধন —মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই শক্তিই সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ-সূর্যকে আপন আপন কক্ষপথে বেঁধে রেখেছে। পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগছে না—কক্ষপথ থেকেও ছিটকে যাচ্ছে না। এই শক্তির জোরেই পৃথিবীর সবকিছু নিরাপদে পৃথিবীতেই থাকতে পারছে—তারা ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না পৃথিবী থেকে। কে এই তরুণ বিজ্ঞানী? ইনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক স্যার আইজ্যাক নিউটন। জন্মঃ ইংলণ্ডের উল্‌স্‌থর্‌পে ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। মৃত্যুঃ ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ।

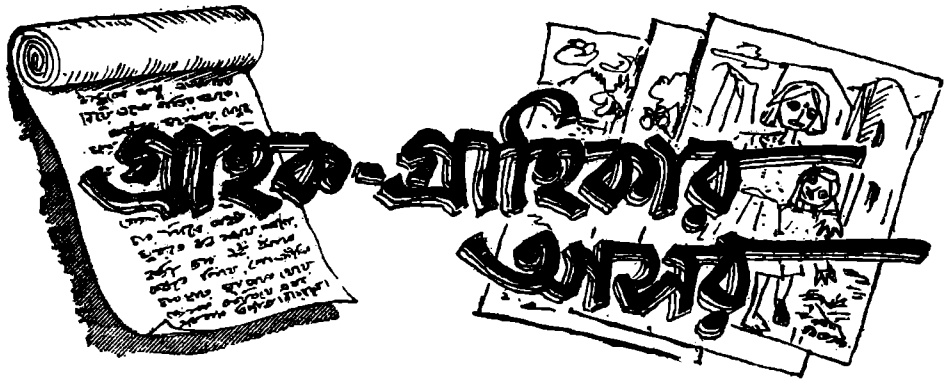

এক চোখো

সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বীভৎস কালো মুখখানা। এক চোখ কানা। যখন সে মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হেসে ওঠে, তখন আরো কুৎসিত দেখায়।

সারা দিন ওর পাত্তা নেই। বোধহয় কালো পেঁচার মত সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটায়, তারপর সন্ধ্যার সময় শিকারের খোঁজে বেরিয়ে আসে পথে—কে জানে, ছেলেধরা না পকেটমার!

মতিয়ার দোকান থেকে ভাঙা জিলিপি কিনে ব্রীজের ওদিকটায় তাকিয়ে চমকে উঠল অমল। সেই বীভৎস চেহারার লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা ঘুড়ি নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ওটাই বোধ-হয় ওর ছেলে ধরার এক মাত্র ফাঁদ। কোন ছেলে সন্ধ্যেবেলায় পথে এলে বোধহয় ঘুড়ির লোভ দেখিয়ে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে।

ছুট্‌ ছুট্‌। ভাঙ্গা জিলিপি শালপাতায় মুড়ে এক দৌড়ে জেলখানার পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলে অমল। উঃ, কী বীভৎস, কী কুৎসিত মুখখানা! দেখলে গা শিউরে ওঠে।

সমস্ত দিন ওর দেখা নেই, ঘুড়ি ওড়াবার সময় হল সন্ধ্যেবেলা—যখন সবাই ঘুড়ির সুতো গুটিয়ে ঘরে ফিরে আসে! বুড়োধাড়ীর লজ্জাও করে না ছেলেদের মত ঘুড়ি ওড়াতে!

সন্ধ্যার একটু আগে অমল মতিয়ার দোকানে একবার ঢুঁ দিয়ে আসতে গেল। শেষ বাজার তখন। অনেকগুলো ভাঙা জিলিপি দিয়ে দেয় দু-পয়সায়।

বেলভেডিয়ারে এদিকটায় দোকান মাত্র ঐ একটা। তা ছাড়া সব বড় বড় বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা, বিদেশী ফুলের বাগান, প্রাচীরঘেরা জেলখানা। একেবারে নিঝুম। এ রাস্তায় না চলে ট্রাম, না চলে ডবল-ডেকার।

সেদিন মতিয়ার দোকান থেকে জিলিপি কিনতে গিয়েছিল অমল। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে লাগল ধীরে ধীরে। অমলের বার বার মনে হতে লাগল সেই কিম্ভুতকিমাকার কানা লোকটার কথা। মতিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে বলল —জল থামলে, আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে মতিয়া ভাই। নইলে ভীষণ ভয় করবে আমার।

মতিয়া অমলকে খুব ভালবাসে। হেসে বলল—কেন খোকাবাবু, ভয় করবে কেন?

অমল তখন সব কথা খুলে বলল। বলল সেই কুৎসিত চেহারার লোকটার কথা।

মতিয়া বলল—ওঃ, সেই এক চোখ কানা লোকটার কথা বলছ? শোন তা হলে ওর গল্প। ও যেমন এক চোখ কানা, তেমনি ওর কারবারও কিন্তু দিনকানা বাদুড়গুলোকে নিয়ে।

অমল কিছু না বুঝে মতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মতিয়া বলল—চিড়িয়াখানার এদিকে ওদিকে আছে অনেক বাদুড়। দিন-কানা বাদুড়গুলো সমস্ত দিন ঝুলে থাকে গাছের ডালে। সন্ধ্যে হলেই চিক্‌ চিক্‌ করে জ্বলে ওঠে ওদের চোখ, চাঁদের আলোতে দিনের মতই স্পষ্ট সব কিছু দেখতে পায়

ওরা। সন্ধ্যে বেলাতেই ওদের ফুর্তি একটু বেশী। তখনই ওরা গাছ ছেড়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। তারপর চাঁদ উঠলেই খুঁজতে লেগে যায় খাবার।

একটু থেমে মতিয়া বলল আবার—সন্ধ্যে বেলাটাই কানার চোস্ত সময়, তখনই সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় মোটা সুতো দিয়ে। সন্ধ্যার আকাশে বাদুড়ের দল যখন আনন্দে গাছ ছেড়ে ঝাঁক বেঁধে আকাশে ঘুরপাক খায়, কানার ঘুড়ি তখন ছোঁ মেরে গিয়ে পড়ে ওদের ওপর। ঘুড়ির মোটা সুতো বাদুড়ের ডানায় বা পায়ে আটকে যায়, তখন ঘুরপাক খেতে খেতে বাদুড়সুদ্ধ ঘুড়ি নেমে আসে মাটিতে। একে একে বাদুড়ে ভর্তি হয়ে ওঠে কানার ঝুড়ি। ঐ বাদুড় বেচেই কানার দিন কাটে। বাদুড়ের মাংস খেতেও বেশ।

ছিঃ ছিঃ, বাদুড়ের মাংস! সমস্ত শরীরটা অমলের ঘিন ঘিন করে উঠল। দিন-কানা বাদুড়গুলোকে ধরে বিক্রি—কানার যেমন চেহারা তেমনি ওর চরিত্র!

মতিয়াকে জিজ্ঞেস করল অমল—আর কোন কিছু করতে পারে না কানা? এমন অন্যায় কাজ করে কেন? দেখবে, শেষে বাদুড়দের মত কানাও দিনে কিচ্ছু দেখতে পাবে না। মত কানাকেও মরতে হবে একদিন।

মতিয়া বলল—কানা আমার কাছে একদিন ওর চোখের কথা বলছিল। ওর ঐ বাকী চোখটাও নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলাতেও ঠিক যেন দেখতে পায় না সব কিছু।

সত্যি!—মতিয়ার কথা শুনে অমলেরও একটু দুঃখ হল মনেঃ কানা তবে সত্যি সত্যি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে? কি উপায় হবে ওর? কেমন করে জুটবে গরীব বেচারার খাবার। সুন্দর পৃথিবীর আর কিছুই দেখতে পাবে না কানা। উজ্জ্বল দিন, অন্ধকার রাত্রি কিছুই বুঝবে না।

মতিয়ার হাসি থামে না, ফিক্‌ফিক্‌ করে হেসে বলে—কানা অন্ধ হতেই চাইছে, তবেই যদি ওর ব্যাধের জীবন শেষ হয়। চাকরী, কাজ—অতো সহজ নয় আজকের দিনে। ঐ ব্যাধগিরিই ওকে করতে হবে পুরো অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

অমল বলল—ইস্‌, ওর কি কষ্ট!

মতিয়া বলল—কষ্ট কি আর? আজ ও কাজ পায় না, শিকার না মিললে খাবার মেলে না। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি অন্ধ হয়ে পথে পথে কেঁদে ফিরবে, তখন আর ওর খাবার দুঃখ থাকবে না, খোকাবাবু। তখন তোমারও পকেট থেকে অন্তত দুটো পয়সা গিয়ে পড়বে ওর হাতে।—বলতে বলতে মতিয়ার দুচোখ জলে ভরে এল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মায়ের কাছে খুব বকুনি খেতে হবে। কিন্তু সে কথা আজ একটুও ভাবছে না অমল। কানার দুঃখের জীবন তার সমস্ত দুঃখকে যেন ম্লান করে দিয়েছে।

অনামী সৈনিক

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

গৌতমকে কেউ চেনে না। চিনবে কি করে? ও তো আর তেমন বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে নি। তা না হলে, আজ আমরা তাকে 'মহাপুরুষের জীবনকথা' বা 'বরণীয় বাঙালী' ইত্যাদি বইয়ে দেখতে পেতাম। নেতাজীর নামের সঙ্গেই দেখতাম গৌতম মুখার্জীর নাম।

বাড়ি থেকে চলে এসেছিল গৌতম। পালিয়ে এসেছিল—না বলে। পালিয়ে এসেছিল বলছি এই কারণে যে, গৌতমের বাবা ছিলেন ব্রিটিশ আমলের এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। ব্রিটিশ-ভক্ত পিতা যেদিন শুনলেন, তাঁর হতভাগ্য পুত্র অ্যানারকিস্ট বা বিপ্লবীদের দলে যোগদান করেছে গোপনে, তখন তিনি কি আর চুপ করে থাকতে পারেন? যার নুন খাচ্ছি, তারই বিরুদ্ধে বসে ষড়যন্ত্র করবে আমার ছেলে? না, না, এসব চলবে না। আমার ঘরে বসে এসব চলবে না। অতএব—

হ্যাঁ, অতএব সতের বছরের মাতৃহীন গৌতমকে মার ফটোটুকু সম্বল করে বাড়ি থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে। তারপর? হ্যাঁ, তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে এসে সে পৌঁছেছিল।

তারপর আপন কর্মদক্ষতায় ক্রমে সে হয়ে উঠলো নেতাজীর অতি প্রিয়পাত্র। নেতাজীর জন্য সে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো, তিন ইঞ্চি চওড়া পাঁচিলের ওপর দিয়ে কাঠবেড়ালীর মত

দৌড়ানো—হ্যাঁ, সবই পারতো সে। সব বিষয়েই তার মত দক্ষ সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজে খুব বেশী ছিল না। অচিরেই অন্য সকলে তাকে 'ক্যাপ্‌টেন' বলে ডাকতে শুরু করলো।

তারপরের কথা বলছি।

আজাদ হিন্দ ফৌজ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সামনে বিপদ—ঘোর বিপদ! পাহাড়ী উপত্যকায় যেখানে সৈন্যদের তাঁবু পড়েছে, তার পশ্চিমের রাস্তাটা চড়াই-উৎরাই-খাড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এক পাহাড়ী নদীর উপরকার একটা কাঠের ব্রীজের ওপর দিয়ে ওপারে ভারতভূমির দিকে এগিয়ে গেছে। কাঠের ব্রীজটা বিশ ফুট লম্বা।

কিন্তু বিপদ কোথায়? বিপদ হচ্ছে ওপারে। সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কাঠের ব্রীজটার ওপারে খুব কাছাকাছি এসে গেছে। আর পৌনে এক ঘণ্টাও লাগবে না ওদের ঐ কাঠের ব্রীজ পার হয়ে এপারে আসতে। ওদের অগ্রগতি রোধ করাও মুশকিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ খাদ্যাভাবে ক্লান্ত। খাদ্য আসতে ও আরো কিছু অস্ত্র আসতে এখনো প্রায় বারো ঘণ্টার ওপর দেরী। কিন্তু তার আগেই যে ব্রিটিশ সৈন্য এসে গেল! তাদের বাধা দিতে হবে। কিন্তু কি করে? খাদ্য নেই, অস্ত্র নেই। একমাত্র আছে শুধু মনের জোর।

তাহলে উপায়?

উপায় ঐ ব্রীজটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে-উড়িয়ে দেওয়া। তাহলে পাহাড়ী নদী—উচ্ছল, উদ্দাম পাহাড়ী নদী ভেঙ্গে আসা খুবই কঠিন হবে ওদের পক্ষে। কিন্তু কি উপায়ে ভাঙ্গা যাবে ব্রীজটা?

কেন, ডিনামাইট দিয়ে। উত্তর পাওয়া গেল সহজেই। কিন্তু কে যাবে? কে যাবে ডিনামাইট ফিট করতে ঐ ব্রীজে? যে যাবে, সে আর হয়তো ফিরে আসবে না। কারণ, ব্রীজটা এমন জায়গায় অবস্থিত যে, ফিতেয় আগুন ধরিয়ে অসমতল পাহাড়ে দৌড়ে ফিরে আসা নিতান্তই কঠিন। হাতে সময় নেই আর। ব্যবস্থা যা কিছু এখুনি করতে হবে। তক্ষুণি লটারী হলো। অনেকেই যোগদান করলো ঐ লটারীতে। তারা চায় মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গের একটা নিদর্শন, একটা কিছু নমুনা রেখে যেতে।

নাম উঠল গৌতম মুখার্জীর।

নেতাজীকে অভিবাদন করে, অন্যান্য সহকর্মীদের বিদায়-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, মনে মনে মাতৃভূমি ও নিজের মাকে প্রণাম করে গৌতম চললো ব্রীজের দিকে—মার্চ করতে করতে। চলনে তার গর্ব ফুটে উঠছে। অন্তরে রয়েছে অনির্বাণ দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহস আর আগত দুশমনদের প্রতি বিজাতীয় আক্রোশ। হাতে রয়েছে ডিনামাইট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

সে পৌঁছালো পাহাড়ী নদীর ধারে। ব্রীজটার ওপর উঠেই কিন্তু সে চমকে উঠলো। কাদের মিলিত কোলাহল শোনা যাচ্ছে না? তবে কি ওরা এসে গেল? অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওদের আসার সময় হয়ে গেছে।

না, আর দেরী নয়। যা করার এই মুহূর্তেই করতে হবে। দেরী করলে পুরো আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাগ্যে ঘনিয়ে আসবে অন্ধকার। তা হয় না। হতে দিতে পারে না গৌতম। সে ভারতবাসী! তার আরো কত ভারতবাসী ভাই চেয়ে রয়েছে তার দিকে। তাদের প্রাণ রক্ষার ভার আজ গৌতমের ওপর।

ঐ তো! ঐ তো দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাঁজোয়া গাড়ী, কামান। শোনা যাচ্ছে তাদের মিলিত কোলাহল। ওরা ব্রীজের কাছে প্রায় এসে পড়েছে। চুপি চুপি গৌতম ডিনামাইটটা ব্রীজের নীচের দিকে একটা খুঁটির গায়ে ফিট করে পলতেটা নিয়ে ফিরে এল। আগুন ধরিয়েই ছুটে একটা খুব বড় পাথরের নীচে গিয়ে দাঁড়াল নিজেকে আড়াল করে।

না, গৌতম পালাল না। সে জানে, সে চেষ্টা বৃথা। কারণ পাহাড়ী খাড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠে ডিনামাইটের রেঞ্জের বাইরে যাওয়া মাত্র পনের সেকেণ্ডের মধ্যে অসম্ভব। তা ছাড়া আর একটা বিপদও আছে। সে দুশমনদের চোখে পড়ে যেতে পারে পালাবার সময়। তাতে ওরা সন্দিহান হয়ে সতর্ক হয়ে ব্রীজ থেকে সরে যেতে পারে। তা হতে দেওয়া চলবে না। এক ঢিলে দুই পাখী মারতে হবে।

দম বন্ধ করে গৌতম দেখছে! হ্যাঁ, ওরা এসে গেছে—প্রচুর সৈন্যসহ চারটে ট্রাক ব্রীজের ওপর উঠেছে। আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে গেল ডিনামাইট। মুহূর্তে ব্রীজটা ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস হয়ে গেল ব্রিটিশ ট্রাক আর প্রচুর সৈন্য। বাকীরা পালাল।

কিন্তু গৌতম? গৌতম কোথায়? ব্রীজের বিক্ষিপ্ত বিরাট টুকরোগুলোর একটা, গৌতম যে পাথরের নীচে লুকিয়েছিল, তার ওপর সশব্দে আছড়ে পড়লো। পরক্ষণে

পাথরটা গৌতমকে নিয়ে গড়াতে গড়াতে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল নীচের দিকে।

নেতাজী ও তাঁর দলের সকলে এ খবর পেলেন। কিন্তু গৌতম বীরের মত প্রাণ দিয়েছে বলে তাঁরা আফসোস করলেন না।

তাই তো বলছিলাম, যে মাত্র আঠারো বছর বয়সেই এত বড় একটা কাজ করে পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছিল, তাকে পৃথিবীর লোক জানবার সময় পেল কখন?

ভয় দেখানোর মাশুল

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

তিন বন্ধু—অমল, শৈবাল এবং কমল। এর মধ্যে অমল ও কমলের মধ্যে বন্ধুত্ব একটু বেশী। শৈবাল তাদের পরিচিত। এক বৃষ্টিঝরা দিনে তিনজনে বসে গল্প করছে। হঠাৎ শৈবাল একসময় বলে উঠল, "জানিস্, তোদের থেকে আমার সাহস বেশী।" সঙ্গে সঙ্গে কমল বলল, "যা, যা, বেশী বড়াই করিস না।"

অমল বলল, "সাহস আছে বুঝব, যদি সামনের অমাবস্যায় শ্মশানে গিয়ে কোন মড়ার আঙুলে লাল সুতো বেঁধে আসতে পারিস।"

শৈবাল বলল, "যা, যা, গল্পে পড়েছিস তো, তাই তোতাপাখীর মত সেই কথা বলছিস। ভাবছিস, আমি হার্টফেল করব।"

অমল বলল, "তাই নাকি? আচ্ছা তাহলে বাজী রাখ্। রাজী?"

শৈবাল রাজী হল। কিন্তু মুখে খুব বড়াই করলেও মনে মনে সে বেশ ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তখন আর পেছোবার উপায় নেই।

এদিকে অমল আর কমল চুপিচুপি পরামর্শ করে ঠিক করল, অমল ঐদিন রাতে মড়া সেজে ঠিক জায়গায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে। তারপর যেই না শৈবাল সুতো বাঁধতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে অমল ধড়-মড়িয়ে উঠে বসবে। তাতেও যদি শৈবাল ভয় না পায়, তবে কমল গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়বে। আগে থেকেই সে গাছে উঠে লুকিয়ে থাকবে।

অমাবস্যার রাত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মেঘ-গর্জনও শোনা যাচ্ছে। শ্মশান ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে শৈবালের। হঠাৎ কে যেন বাচ্চা ছেলের মতো ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল। শৈবাল জানে যে, ওগুলো শকুনের বাচ্চা। তা সত্ত্বেও ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ভয়ে মুচড়ে উঠল। তবুও সে প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে এগোতে লাগল। শ্মশানের কাছে গিয়ে সে দেখল, কি একটা নিয়ে কতকগুলো শেয়াল টানাটানি করছে। শেয়ালগুলো মানুষ দেখে সরে গেল।

শ্মশানে গিয়ে পৌঁছলো শৈবাল।

পিচের মত কালো অন্ধকার। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই শৈবাল দেখল, অদূরে কম্বল ঢাকা একটা মড়া পড়ে রয়েছে। সে এগিয়ে গেল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। তারপর যেই না সে মড়াটার আঙুলে লাল সুতো বাঁধতে গেছে, অমনি মড়াটা ধড়মড়িয়ে উঠল। মরার আগে মানুষ বুঝি মরিয়া হয়ে যায়। শৈবালেরও তখন সেই রকম অবস্থা। সে লুকিয়ে আনা ছুরিটা পকেট থেকে বের করে প্রাণপণে মড়াটার গলায় বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মড়াটা একটা আর্তনাদ করে স্থির হয়ে গেল।

শৈবাল ছুট দিল। এ দিকে আর্তনাদ শুনে গাছের উপর থেকে কমল ভাবল, শৈবাল বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাই সে গাছ থেকে লাফ দিল। গাছের পাশ দিয়ে ছুটছে শৈবাল। অন্ধকারে কমল শৈবালের গায়ের উপর এসে পড়ল। শৈবাল তখন ভয়ে যেন পাগল হয়ে গেছে। চোখ বুঝে সে প্রাণপণে ছোরা চালাল। কমল জাপ্‌টে ধরল তাকে। তারপর দুজনে শুরু হল ধস্তাধস্তি.....

পরদিন কয়েকজন লোক শ্মশানে মড়া নিয়ে গিয়ে দেখল, তিনটি ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতদেহ-গুলি চিনতে বিশেষ অসুবিধা হল না। ব্যাপারটা আন্দাজ করতেও অসুবিধা হল না।

সুজনবন্ধু

ডায়মণ্ড হারবার থেকে **বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত** লিখেছেঃ

প্রিয় সুজনবন্ধু, এ দুনিয়ায় যে যাই করুক না কেন, তার এই সব কিছু করার পেছনে জড়িয়ে রয়েছে নিজের স্বার্থ। রাগ করো না, এমন কি বাবা-মা যে সন্তানদের প্রতিপালন করে মানুষ করে তোলেন, তার পেছনেও তাঁদের স্বার্থ জড়িত আছে। আর তা হলো, সন্তানদের বড় করে তুললে তারাই আবার ওঁদের বৃদ্ধ বয়সে দেখাশুনো করবে। একেই আমরা বলে থাকি 'কর্তব্য'। কিন্তু স্বার্থ এবং কর্তব্য, এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় সময় সময় কি একে অপরের সঙ্গে জড়িত থাকে না? একেবারে নিঃস্বার্থভাবে কেউ কি কর্তব্য পালন করে থাকে?

ভাই বিশ্বনাথ, তোমার প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলি, —যে দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি বিষয়টিকে বিবেচনা করেছ, সেটা বোধহয় ঠিক নয়। এই দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অসংখ্য বড় বড় কাজ বা কর্তব্য করে গেছে, এখনো করছে, ভবিষ্যতেও করবে। এখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য। এ পার্থক্য বিরাট—মানবতা ও মনুষ্যত্বের পার্থক্য। আর এই মনুষ্যত্ব ও মানবতা আছে বলেই মানুষের সভ্যতা সেই আদিম বর্বর অবস্থা থেকে আজ এত দূর আসতে পেরেছে। তার এই অগ্রগতির বোধহয় শেষ নেই।

বাপ-মায়ের সন্তান স্নেহ সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুমি তুলেছ, তাতে গুরুতর গলদ আছে মনে হয়। একটা উদাহরণ দেই। বাপ-মায়ের পাঁচ ছেলে। তার মধ্যে চার ছেলেই সক্ষম, উপার্জনশীল। কিন্তু একটি ছেলে হয়তো অন্ধ বা পঙ্গু। এ ক্ষেত্রে কি দেখা যায়? দেখা যায়, বাপ-মায়ের, বিশেষতঃ মায়ের যত কান্না ও আকুলতা এই অক্ষম সন্তানটিকে নিয়ে, সবার অলক্ষ্যে তাদের মনে রক্ত ঝরে ঐ পঙ্গু ছেলেটির বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে? এখানে কোথায় তোমার ঐ স্বার্থবুদ্ধি?

সন্তান লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে বাবা-মায়ের মনে যদি বার্ধক্যে স্বস্তি লাভ করার একটু কামনা উঁকি মারে, তাতে স্বার্থবুদ্ধি কোথায়? তাকে মিষ্টি মধুর ছোট্ট একটুখানি স্বপ্ন হিসাবে দেখাই কি ঠিক নয়?

স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণে ভাই ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেয়, বাবা-মা সন্তানের জন্য প্রাণ দেয়, বন্ধু বন্ধুর জন্যে প্রাণ দেয়। এর মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি কোথায়?

দেশের মানুষের মুক্তির জন্য শত শত তরুণ অত্যাচারীর গুলিতে জীবন আহুতি দেয়, ফাঁসী কাঠে ঝোলে। এ রকম ঘটনা আমাদের দেশে ও বিদেশে অসংখ্য ঘটেছে, আজো ঘটছে। এখানে কোথায় সেই সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি, যার উল্লেখ তুমি করেছ?

অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি, দেশপ্রেম, পরার্থে আত্মদান প্রভৃতি গুণগুলি আছে বলেই মানুষ আজ এত বড় হতে পেরেছে। বিকৃত ভুল তত্ত্ব ও তথ্যের শিকার না হয়ে এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মানবিক গুণগুলি বিচারের ব্যর্থ চেষ্টা না করে এগুলি যাতে আমরা অর্জন করতে পারি, তার জন্যে মনেপ্রাণে চেষ্টা করাই কি উচিত নয়, ভাই?

মেদিনীপুর থেকে **স্বপনকুমার মাইতি** লিখেছেঃ

ভাই সুজনবন্ধু, আজ একুশ-বাইশ বছর পরে প্রশ্ন উঠেছে, ভারতকে বিভক্ত করার দায়িত্ব কার ছিল? দোষ কারো না কারও ছিল নিশ্চয়ই। যাঁরা গদির লোভে দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে পারেন, তাঁরা কেমন দেশ-নেতা বলতে পার? ধর্মের ধুয়া তুলে আমাদের হৃদয়কে কয়েকটি রেখা টেনে দুটো করে দেওয়া হয়েছে।

আজ সীমান্তের ওপারে কোন মায়ের অসুখ হলে কিছু করার নেই শুধু চিঠি দেওয়া ছাড়া। ওপারে বন্যা হলে আমাদের করার কিছুই নেই শুধু শোনা ছাড়া। তেমনি এপারে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হলে ওপারের লোকেরাও অসহায়, কিছুই করতে পারে না। কেন এমন

হলো, বলতে পার সুজনবন্ধু? কি স্বার্থে আমাদের এভাবে শাস্তি দেওয়া হলো? আমরা কি সাম্প্রদায়িকতা ভুলে গিয়ে ভাই-ভাই এক সঙ্গে বাস করতে পারতাম না?

আচ্ছা, সুজনবন্ধু, মনে করো, আমি পূর্ব পাকিস্তানের কাউকে বার্ষিক 'কিশোর ভারতী' উপহার দিতে চাই। তাহলে কিভাবে পত্রিকাটি তাকে পাঠাবো?

ভাই স্বপন, যে প্রশ্ন তুমি উত্থাপন করেছ, তা অত্যন্ত গুরুতর। ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের বাঁচা-মরার স্বার্থ যে প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, এই স্বল্প পরিসরে তার সুষ্ঠু আলোচনা কতটুকু করা সম্ভব, তা বোধহয় অনুমান করতে পার।

আমাদের এই ভারতবর্ষ প্রধানতঃ দুটি সম্প্রদায়ের বাসভূমি—হিন্দু ও মুসলমান। যে নীতি অবলম্বন করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশ শাসন করতো, তাকে এক কথায় বলা যায়, 'ভাগ করে শাসন করার নীতি'। নানা ভাবে মিথ্যা সূক্ষ্ম প্রচার ও কারসাজির মাধ্যমে এবং বহু অন্যায় আইন চালু করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করতো, পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি লেলিয়ে দিত। কিন্তু এটা তারা করতো এমনভাবে যে, সরল অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ তাদের এই কারসাজি ধরতে পারতো না। তার ফলে পরস্পরের প্রতি হিন্দু-মুসলমান জনতার বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়ে যেত। শেষ পর্যন্ত বাধতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নিরপরাধ হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান জনতা সে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় প্রাণ হারাতো, সর্বস্বান্ত হতো। একমাত্র লাভবান হতো ইংরেজ শাসকেরা। নির্বিচারে তারা আমাদের শাসন ও শোষণ করতো।

কিন্তু চিরকালই কি এই অবস্থা চলতো? না।

হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ চেতনা ফিরে এলেই, প্রকৃত ঘৃণ্য শত্রুকে তারা চিনতে পারতো, ইংরেজ-বিরোধী বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে ফেটে পড়তো তাদের ঘৃণা ও ক্রোধ। ভয়ে কেঁপে উঠতো ইংরেজের মসনদ। মাঝে মাঝেই তখন ঘটছিল এই অবস্থা।

শেষ পর্যন্ত এ অবস্থা চূড়ান্ত রূপ নিল গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। ইংরেজ-বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়লো গোটা ভারতবর্ষ। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান জনতা হাতে হাত মিলিয়ে পথে নামলো। দেশপ্রেমে উদ্বেল হয়ে উঠলো ভারতবর্ষের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সুবিশাল জনসমুদ্র। বিক্ষোভ নানা স্থানে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নিতে লাগলো। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীও পিছিয়ে থাকলো না। নৌ-সৈন্যেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলো, কামানে কামানে লড়াই চললো।

ধূর্ত সন্ত্রস্ত ইংরেজ শাসকেরা বুঝলো, তাদের প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষ শাসন করার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তারা আপোসের পথ খুঁজতে লাগলো। দেশে তখন দুটি পার্টি সবচেয়ে শক্তিশালী—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। গণ-বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখে তাদের নেতারাও চমকে গিয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো বুঝেছিলেন, এই জঙ্গী বিক্ষোভ যদি এখনি বন্ধ না করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁদেরও নেতৃত্ব হারাতে হতে পারে। সুতরাং ইংরেজের আপোস-প্রস্তাব তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

তারপরেই শুরু হলো বিয়োগান্ত মহানাটকের শেষ মর্মান্তিক দৃশ্য। দ্রুত ঘটে চললো ঘটনার পর ঘটনা। দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক কুৎসা ও অপপ্রচারের তুফান বয়ে চললো। তার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আবার বাধলো ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভাইয়ের রক্তে দেশ ভেসে গেল, ভেসে গেল ইংরেজদাসত্ব-বিরোধী বিক্ষোভ-বিদ্রোহ। আর তার মধ্যে বসে নেতারা ইংরেজের সঙ্গে আপোস করলেন। হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি,—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশকে কেটে ভাগ করা হলো। পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র,—সে রাষ্ট্র শাসনের ভার পেলেন মুসলিম লীগের নেতারা। আর ভারত রাষ্ট্র শাসনের ভার নিলেন কংগ্রেস নেতারা।

হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি, এই তত্ত্ব যে আগাগোড়া অবৈজ্ঞানিক, ভুল ও অমানুষিক, তা কি দেশের নেতারা বুঝতেন না? সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যা বুঝতে পারে, দেশের বাঘা বাঘা নেতারা তা বুঝতেন না,—কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কি করে মানবে এ কথা?

বাঙালী একটা জাতি। তার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের মানুষ, যেমন—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি। তেমনি হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি নিয়ে মারাঠী একটা জাতি; হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি নিয়ে পাঞ্জাবী একটা জাতি। তেমনি ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি এক-একটা জাতি। তাদের মধ্যে ইহুদি, খ্রীষ্টান প্রভৃতি একাধিক ধর্মের বা সম্প্রদায়ের লোক আছে। জাতি ও সম্প্রদায় যে এক নয়, এই সাদা কথাটা নেতারা বুঝতেন না এবং না বুঝে ধূর্ত ইংরেজের নিষ্ঠুর জঘন্য চক্রান্তে অংশ গ্রহণ করেছিলেন,—এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

পূর্ব পাকিস্তানে কিশোর ভারতী যদি পাঠাতে চাও, তাহলে তা ডাকে পাঠাতে হবে। অবশ্য যথাস্থানে পৌঁছবে কিনা, তা কর্তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে।

সাহিত্য ধাঁধা

এ সংখ্যায় আর এক ধরনের মজার ধাঁধা দেওয়া হল। এর নাম 'সাহিত্য-ধাঁধা'। তুমি দৈনন্দিন যে সব বই পড়, তার অংশবিশেষ মনে রাখতে হলে এ ধরনের ধাঁধার সাহায্য নিতে পার।

পাঠ-সংকলন (নবম ও দশম শ্রেণীর) তোমরা অনেকেই পড়েছ, পড়ছ এবং পড়বে। বর্তমান ধাঁধার বিভিন্ন অংশ পাঠ-সংকলন হতে নেওয়া হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটিকে (ক), (খ), (গ) ইত্যাদি করে আলাদা নম্বর দেওয়া হয়েছে।

'কে লেখক?' এই শিরোনামায় এখানে একটা ছক দেওয়া আছে, দেখবে। ঐ ছকের প্রত্যেকটি ঘরেও ঐ রকম (ক), (খ), (গ) ইত্যাদি করে নম্বর দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক ঘরে দুজন করে লেখকের নাম আছে। উদ্ধৃত কোন অংশের নম্বর অনুযায়ী ছকের ঘরের নম্বর মিলিয়ে সেই ঘরের দুজন লেখকের মধ্যে কে উক্ত অংশের সঠিক লেখক, তা তোমাদের বের করতে হবে। যেমন ধর, (ক)-অংশের লেখক কে, তোমাদের বের করতে হবে। ছকের (ক)-এর ঘরে দেখ, দুজন সাহিত্যিকের নাম আছে —এক শরৎচন্দ্র, দুই বঙ্কিমচন্দ্র। উক্ত (ক)-অংশের লেখক হলেন দুই অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র।

উত্তরগুলো তোমরা ছক অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে লিখে ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬৯ তারিখের মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিও।

উদ্ধৃত অংশ

(ক) তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

(খ) স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।

(গ) "হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?

(ঘ) গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।

(ঙ) আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে?

ছক ঃ কে লেখক?

	এক	দুই
(ক)	শরৎচন্দ্র	বঙ্কিমচন্দ্র
(খ)	ঈশ্বরচন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ	নজরুল
(ঘ)	রবীন্দ্রনাথ	কৃত্তিবাস
(ঙ)	মধুসূদন	হেমচন্দ্র
(চ)	অবনীন্দ্রনাথ	দ্বিজেন্দ্রনাথ
(ছ)	শিবরাম	শরৎচন্দ্র
(জ)	শরৎচন্দ্র	বিভূতিভূষণ
(ঝ)	প্রমথ চৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ
(ঞ)	ঈশ্বরচন্দ্র	রামেন্দ্রসুন্দর
(ট)	দ্বিজেন্দ্রলাল	বিবেকানন্দ
(ঠ)	জগদীশচন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ
(ড)	বিবেকানন্দ	জগদীশচন্দ্র
(ঢ)	কাশীরাম দাস	নবীনচন্দ্র সেন
(ণ)	দ্বিজেন্দ্রলাল	সুনির্মল বসু

(চ) মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন;

(ছ) খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া।

(জ) অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই।

(ঝ) শুধু লাঠিখেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই যথা—সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে তিনিই দিগ্বিজয়ী হন যাঁর শরীরে এই দৈব-শক্তি ভর করে।

(ঞ) রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত।

(ট) তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত; সরকারের কাছে সব নেটিভ।

(ঠ) —সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর আর পাঁক আর জল।

(ড) এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টি-কর্তার হস্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন

(ঢ) নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।

(ণ) জননি, তোমার বক্ষে শান্তি,
কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন,
চরণে তোমার বিতর মুক্তি;

১নং ছক

১ ভো	২ গা	য়	৩ ত	৪ ন		৫ আ	৬ প	সো	৭ স
৮ জ	য়		৯ লা	ভ		১০ ব	দ		ড়
১১ না	ক	১২ চ		১৩ স্থ	লা	র	বি	ন্দ	
গা		১৪ ক	১৫ পা	ল		ক			১৬ প
১৭ র	১৮ ঘু	ব	র		১৯ ব		২০ লো	কে	শ
	২১ ন	ন্দি	ত		২২ রা	২৩ ও	ল		মি
২৪ শা	সি		২৫ প	২৬ দা	হ	ত		২৭ পা	না
শ্ব		২৮ আ	ক্ষে	প		২৯ প্রো	৩০ বে	ট	
৩১ তি	৩২ জে	ল		৩৩ ক	৩৪ পো	ত	পা	লি	৩৫ কা
৩৬ ক	র	তা	ল		ক্ত		র		ঙ্খা

সঙ্গে শীঘ্রই যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

বন্ধুদের মধ্যে কম-বেশী ভুলের জন্য যারা এবার পুরস্কার পেল না, আশা করব তারা পরবর্তী প্রতি-যোগিতায় সফল হবে।

আলোচ্য "অভিনব শব্দ-হেঁয়ালি প্রতিযোগিতা"-য় শব্দ-হেঁয়ালির যে ছক দুটি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ১নং ছকটি তৈরি করেছেন অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ২নং ছকটি তৈরি করেছেন অধ্যাপক সমীরকুমার ঘোষ (বিশ্বভারতী)।

২নং ছক

১ ম্যা	ক	২ মি	লা	ন		৩ এ	৪ ডি	৫ স	ন
ক্ল	৬ ক	ফি	ন			৭ ক	না	ৎ	
ও	৮ জ	ং		৯ এ			১০ মা	বি	ন
যে		১১ গ্যা	মি	ট			ই	স্ব	
১২ ল	১৩ রে	ন	স্		না		ট		১৪ ফা
	১৫ ডি	গ্রী		১৬ ম্যা		১৭ টে		১৮ সা	রে
	ও		১৯ ভি	ষ্টো	ং	লি	ন		ন
২০ বে	থে		ট্রি	ড		২১ ভি	নো		হা
	২২ রা	২৩ মা	য়	ণ		শ		২৪ বা	ই
	২৫ পি	ছ	ল		২৬ লী	ন		২৭ কী	ট

গত শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত "অভিনব শব্দ-হেঁয়ালি প্রতি-যোগিতা"-র ফলাফল

গত শারদীয়া সংখ্যার কিশোর ভারতীতে একটি "অভিনব শব্দ-হেঁয়ালি প্রতিযোগিতা"-র আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের কিশোর-কিশোরী বন্ধুরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে বিচারকের রায়ে নিম্নলিখিত মাত্র এক-জনই ঘোষিত পুরস্কার (দশ টাকা) পাবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছেঃ

উজ্জ্বল সান্যাল, কলিকাতা ৩০।

পুরস্কার গ্রহণের জন্য উক্ত বন্ধুকে আমরা কিশোর ভারতীর কর্মাধ্যক্ষের

ব্যাটিং করার গোড়ার কথা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় আমরা ভাল ব্যাটসম্যান হতে হলে কিংবা মোটামুটি ধরনের ব্যাটিং করতে হলে সবার আগে যে সব বিষয়গুলি জানতে হবে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। তার ফলে আমরা এখন জানি, কোন্ ব্যাট কার পক্ষে ভাল, কি ভাবে ব্যাট ধরতে হয়, কিংবা কি ভাবে ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে হয়। তাছাড়াও জানি, ব্যাক লিফট অর্থাৎ ব্যাট পেছনে তোলার কায়দাগুলো।

এই কটি জিনিসই হলো ব্যাটিং করতে শেখার প্রাথমিক বিষয়। এর পরই আমাদের জানতে হবে আত্মরক্ষামূলক (ডিফেন্সিভ) খেলার কায়দাগুলো আর শিখতে হবে রান তোলার জন্যে বিভিন্ন মারের ধরনগুলো। কিন্তু তার আগে আমাদের বিভিন্ন বল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। কারণ কোন্ বলে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলতে হয় আর কোন্ বলে মেরে খেলতে হয়, তাই যদি আমরা না জানি, তাহলে খেলবো কি করে?

তাই ব্যাট ধরতে শেখা, কিংবা ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বলের কথাও আমাদের জানা দরকার।

কোন্‌টা কি ধরনের বল, কোন্ বলটার কি নাম, তা পুরোপুরি ভাবে নির্ভর করে বোলার বল করার পর বলটা কোথায় পিচ খায় তার ওপর। ক্রিকেট মাঠে বাইশ গজ লম্বা পিচের দুপ্রান্তে তিনটে স্টাম্প আর দুটি বেলের দুটি উইকেট পোঁতা থাকে। সেই উইকেটের একদিকে ব্যাটসম্যান ব্যাট নিয়ে দাঁড়ায় আর একদিক থেকে বোলার বল করে।

এক-একটা উইকেটে তিনটে করে স্টাম্প থাকে উইকেটের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিকের স্টাম্পটার নাম অফ স্টাম্প, মধ্যেরটার নাম মিডল স্টাম্প আর ডান

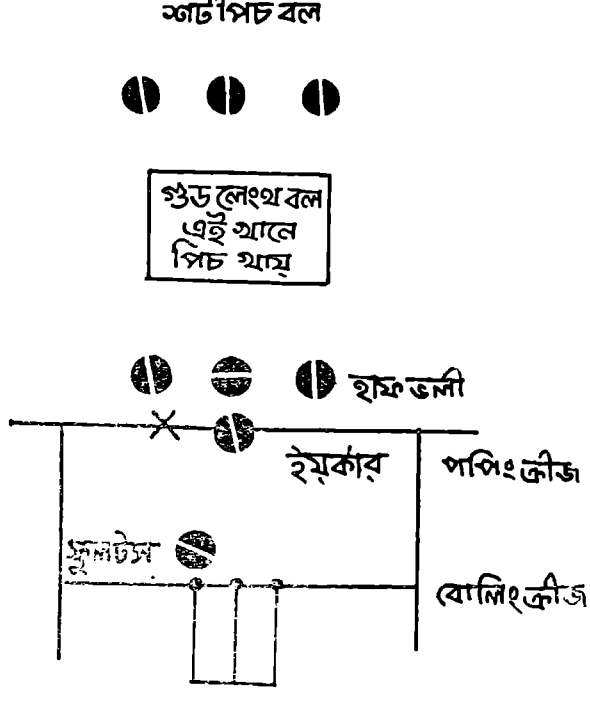

১নং ছবি

দিকেরটার নাম লেগ স্টাম্প। বোলার বল করার পর কোন বল হয়তো অফ স্টাম্প, মিডল স্টাম্প কিংবা লেগ স্টাম্পের সোজাসুজি আসে, নয়তো অফ স্টাম্প কিংবা লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যায়।

এক নম্বর ছবিতে দেখান হয়েছে, বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর কোন্ বলটা কোথায় পিচ খায়। ছবিটা ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, শর্ট পিচ বলগুলো ব্যাটসম্যানের দিককার উইকেট থেকে অনেক দূরে পিচ খায়। অনেক দূরে পিচ খায় বলে ব্যাটসম্যান এই বলগুলো দেখে শুনে মারার মতো অনেক সময় পায়। শর্ট পিচের সামনে অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের আরো কাছাকাছি যে বলগুলো পিচ খায়, তার নাম গুড লেংথ বল। গুড লেংথ বলে ব্যাটসম্যানের খেলতে খুব অসুবিধা হয়। গুড লেংথের সামনে ব্যাটসম্যানের আরো কাছে পিচ খাওয়া বলগুলোর নাম হাফ ভলী। খুব সহজেই এক পা বাড়িয়ে এই বলগুলো মারা যায়। পপিং

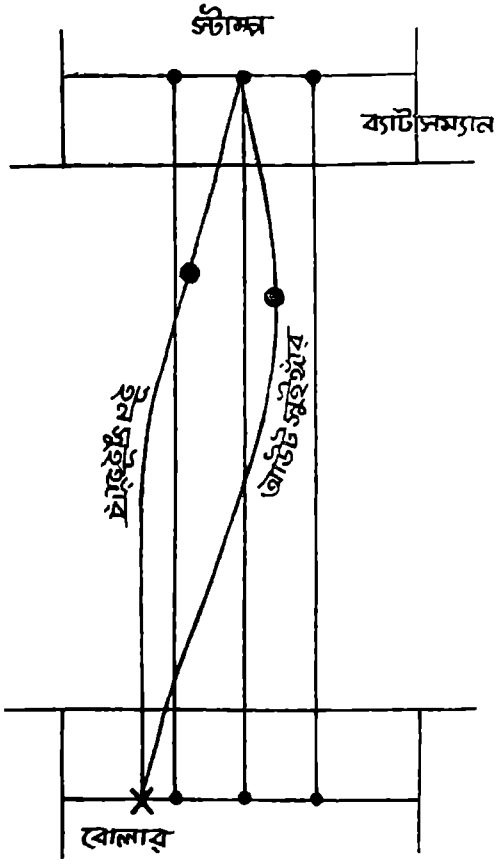

২নং ছবি

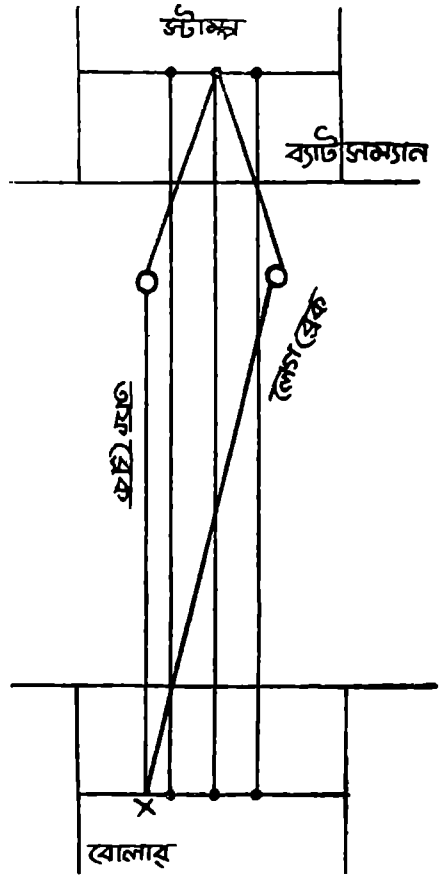

৩নং ছক

ক্রীজের ওপর যে বলগুলো এসে পড়ে, তার নাম ইয়র্কার আর উইকেটের গায়ে এসে পড়া বলগুলোর নাম ফুলটস।

মোটামুটিভাবে ঐ কটি জায়গাতেই বল পিচ খায়। সোজা বলগুলো সম্বন্ধে কোন ঝামেলা নেই। ওগুলো পিচ খাওয়ার পর সোজাসুজি উইকেটের দিকে ধেয়ে আসে। কিন্তু মুশকিল হয় সেই সব বলগুলো নিয়ে, যেগুলো এদিক-ওদিক দিয়ে হঠাৎ ঘুরে কিংবা ধনুকের মতো বেঁকে উইকেটের দিকে আসে।

ফাস্ট বোলাররা বলগুলো ধনুকের মতো ঘুরিয়ে দেয় উইকেট লক্ষ্য করে অর্থাৎ সুয়িং করায়। এই বলগুলো বড়ই মারাত্মক। বাতাসের ওপর ভর করে এই বলগুলো উইকেটের দিকে ছুটে যায় ধনুকের মতো বেঁকে।

দু নম্বর ছবিটিতে সুইংগার বলগুলো কিভাবে

উইকেটের দিকে যায়, তাই দেখান হয়েছে। সুইঙ্গার বল দু রকমের। যে বলগুলো অফের দিক থেকে বাঁক খেয়ে উইকেটে ঢোকে, সেগুলোর নাম ইন সুইঙ্গার, আর যেগুলো অনের অর্থাৎ লেগের দিক থেকে বাঁক খেয়ে যায়, তার নাম আউট সুইঙ্গার। যতক্ষণ বলের পালিশ অর্থাৎ চকচকে ভাবটা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফাস্ট বোলাররা বল সুয়িং করাতে পারে। ফাস্ট আর মিডিয়াম ফাস্ট বোলারদের সবচেয়ে বড় অস্ত্রই হলো এই সুইঙ্গার বলগুলো।

ফাস্ট বোলাররা যেমন বল সুইং করিয়ে ব্যাটসম্যানকে বিপদে ফেলে, স্লো বোলাররাও তেমনি বিপদ সৃষ্টি করে বল স্পিন করিয়ে অর্থাৎ ব্রেক বল দিয়ে। প্রধানতঃ স্পিন বল দু রকমের। অফ ব্রেক আর লেগ ব্রেক। যে বলগুলো পিচ খেয়ে ডান দিকে অর্থাৎ লেগ স্টাম্পের দিকে ঘুরে যায়, তার নাম অফ ব্রেক বল, আর যে বলগুলো পিচ খাওয়ার পর বাঁ দিকে অর্থাৎ অফ স্টাম্পের দিকে ঘুরে যায়, তার নাম লেগ ব্রেক বল। সুইং বলগুলো অনেক সময় শুনোই ঘুরতে শুরু করে। ব্রেক বলগুলো কিন্তু পিচ খাওয়ার আগে ঘোরে না।

তিন নম্বর ছবিতে অফ ব্রেক আর লেগ ব্রেক বলগুলো সাধারণতঃ কিভাবে যায়, তাই দেখানো হয়েছে। স্লো বোলারদের এই মারাত্মক অস্ত্র স্পিন বোলিংকে রীতিমতো ভয় করে চলে ব্যাটসম্যানরা।

ভাল ব্যাটসম্যান হতে গেলে কিংবা ভালভাবে ব্যাটিং করতে হলে বিভিন্ন ধরনের বল সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকার দরকার। পরের সংখ্যায় আমরা আবার ব্যাটিং করার বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

খেলোয়াড় পরিচিতি

বিশ্বনাথ

কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করে বিশ্বনাথ ভারতীয় দলে নিজের স্থানটা শুধু পাকা করেই নেন নি, ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে নিজের নামটা চিরকালের জন্যে লিখিয়ে রাখলেন। মহীশূরের ২১ বছরের অলরাউন্ডার বিশ্বনাথ ডান হাতে ব্যাট করেন আর ডান হাত দিয়েই করেন লেগ ব্রেক বল। বিশ্বনাথের হাতের জোর খুব। কব্জি ঘুরিয়ে ব্যাট চালালে বলগুলো বুলেটের মতো ছুটে যায় বাউণ্ড্রির দিকে। কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা তাই ভারতের এই নবাগত তরুণ খেলোয়াড়ের খেলা দেখে বিস্ময়ে থ হয়ে গেছেন। বিশ্বনাথ চিরকালই প্রথম খেলাতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। দু বছর আগে ১৯৬৭ সালে বিশ্বনাথের বয়েস যখন মাত্র উনিশ, তখনই তিনি সর্ব প্রথম মহীশূরের পক্ষে অন্ধ্রের বিপক্ষে রণজি ট্রফির খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পান। সেই খেলায় বিশ্বনাথ করেছিলেন ২৩০ রান। যাই হোক অস্ট্রেলিয়া এখন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দল। সেই দলের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথ যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, ভারতীয় দর্শক এবং দু দলের খেলোয়াড়রা বোধহয় সে কথা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। তাই মনে হয়, বিশ্বনাথ এবছরে ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার।

মজার ঘটনা

ডব্লিউ জি. গ্রেসের নাম আমরা সকলেই শুনেছি। গ্রেসকে বলা হয় ক্রিকেট খেলার জনক। একমুখ দাড়িগোঁফে ভরা ছিল ডাক্তার গ্রেসের মুখ। সেই দাড়িই একদিন বাধালো বিপত্তি। সেদিন খেলা হচ্ছিল সারের সঙ্গে গ্লাস্টারশায়ার দলের। গ্রেস ব্যাট করছেন। একটা বল মেরে রান নিচ্ছেন। দুটো রানের পর তৃতীয় রানের জন্যে তিনি ছুটছেন তখন, এমন সময় বাউণ্ড্রির সীমার কাছাকাছি একজন ফিল্ডার বলটা ধরে ছুড়ে দিলেন উইকেটরক্ষকের দিকে। কিন্তু বলটা গিয়ে লাগলো গ্রেসের বুকে। তারপর টুপ করে ঢুকে গেল তাঁর বুকপকেটের মধ্যে। দাড়ির আড়ালে বুকপকেট। তাই আর কিছু দেখার উপায় রইল না। কোথায় গেল বলটা? ফিল্ডাররা যে যার মাথা চুলকোচ্ছেন আর গ্রেস ওদিকে চলেছেন একটার পর একটা রান নিয়ে। হতভম্ব ফিল্ডারদের একজনের মাথায় হঠাৎ ঢুকলো ব্যাপারটা। তিনি ছুটে এসে গ্রেসের পকেট থেকে তুলে নিলেন বলটা। ততক্ষণে গ্রেসের ছটা রান নেওয়া হয়ে গেছে। এর পরই 'ডেড বল' নিয়মটা চালু হলো। ঠিক হলো যে, বল যদি ব্যাটসম্যানের পোশাকের মধ্যে আটকে যায়, তাহলে আর রান নেওয়া যাবে না। বলটা 'ডেড' হয়ে যাবে।

খেলার আসর

শ্রীসাংবাদিক

খবরের কাগজের খেলার পাতা এখন জমজমাট। একটার পর একটা খবর। ধরতে গেলে সবই অবশ্য এখন ক্রিকেটকে নিয়ে। তবে বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপের খেলার খবর, টেনিস খেলায় কে হারলো, কে জিতলো, সেসব খবরও থাকে মাঝে মাঝে। তবে আসল আর খবরের মতো খবর হচ্ছে এখন ক্রিকেট।

বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেছে আট উইকেটে। তারপরই কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের খেলোয়াড়রা খেললেন প্রাণ দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। অথচ কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টের দলটি ছিল নতুন খেলোয়াড় দিয়ে গড়া। বিশ্বনাথ, সোলকার, মানকাদ, গান্দ্রোত্রা, গুহ প্রভৃতি নতুন খেলোয়াড়রা ছিলেন দলে। তাই জান লড়িয়ে খেলেছিলেনও তাঁরা।

বিশ্বনাথ তো তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলাতেই শতরান করলেন। বিশ্বনাথ প্রথম ইনিংসে শূন্য করেছিলেন আর দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ১৩৭ রান। বিশ্বনাথের আগে মাত্র পাঁচ জন ভারতীয় ব্যাটসম্যান জীবনের প্রথম টেস্ট খেলাতেই শতরান করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হলেন লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলী বেগ আর হনুমন্ত সিং।

বাংলা দেশের মিডিয়াম স্পেস বোলার সুব্রত গুহও খুব ভালো বোলিং করেছেন। ভেঙ্কট রাঘবনের বলও খুব ভাল হয়েছিল। ব্যাটিংয়ে বিশ্বনাথ, অশোক মানকাদ, সোলকার, পাতৌদি, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি ব্যাটসম্যানরা দিয়েছিলেন উন্নত ধরনের ব্যাটিং নৈপুণ্যের পরিচয়।

সেই পরিচয়ই আরো ভাল ভাবে পাওয়া গেল দিল্লীর ফিরোজ-শা-কোটলা মাঠে। ভারতের খেলোয়াড়রা উচিত জবাব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী আর তাঁর দলের খেলোয়াড়দের। দিল্লীতে গিয়েই লরী বলেছিলেন যে, টসে জিতলে তাঁরা জিতবেনই। সেই টসে তাঁরা জিতলেনও। কিন্তু তারপর কি হলো?

হলো অনেক কিছুই। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে অস্ট্রেলিয়া অনেক রানে এগিয়ে থাকলো। কিন্তু পিচ তখন ফাটছে। বল ঘুরছে লাট্টুর মতো। আর তারই সুযোগ নিলেন পাতৌদি। প্রসন্ন আর বেদীকে দিয়ে বল করিয়ে মাত্র ১০৭ রানে শেষ করে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস। তারপর ওয়াদেকার, বিশ্বনাথ আর বেদী শক্ত হাতে ব্যাট ধরে শেষ পর্যন্ত জব্দ করলেন অস্ট্রেলিয়াকে। অস্ট্রেলিয়া হেরে গেল সাত উইকেটে। এর আগে আর মাত্র দুবার ভারত হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। ১৯৫৯ সালে কানপুর টেস্টে ১১৯ রানে আর ১৯৬৪ সালে বোম্বাই টেস্টে দু উইকেটে ভারত জিতেছিল।

কিন্তু দিল্লী টেস্টে ভারত জেতায় কলকাতার অবস্থা এখন শোচনীয়। শুধু টিকিট আর টিকিট। টিকিট ছাড়া অন্য কোন কথা নেই কারো মুখে। বাংলাদেশের ক্রিকেট-রসিকরা একখানা টিকিট সংগ্রহ করার জন্যে এখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কজন আর টিকিট পাবেন? তবে সব থেকে মুশকিল হয়েছে ছোটদের। খেলা দেখার ইচ্ছে ওদের সব থেকে বেশী। প্রয়োজনও কম নয়। কারণ নামকরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখে অনেক কিছুই শেখা যায়। কিন্তু সে কথা ভাবেন কজন? তাই ছোটদের অর্থাৎ কিশোর-কিশোরী-দের খেলা দেখা কপালে প্রায় জোটেই না।

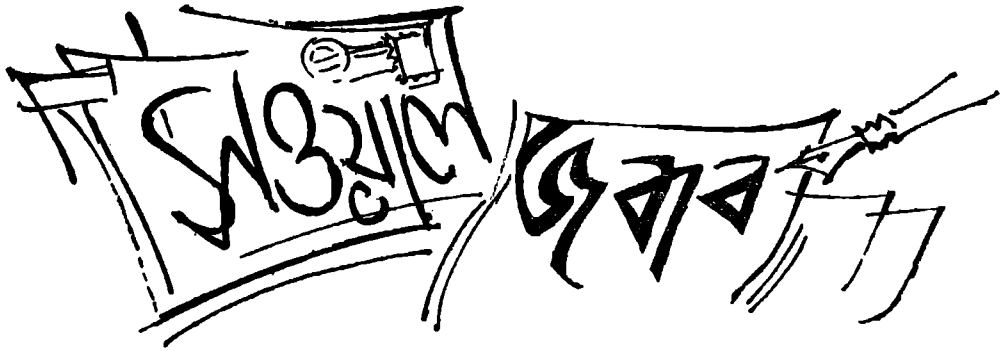

বাণী মৌলিক

দীপায়ন ভট্টাচার্য, কুচবিহার

—বড়দের সাহিত্য জগতে ছোট লেখক বা নতুন লেখকদের ঠাঁই হয় না কেন, তা সেই লেখকদের লেখা যতই ভাল হোক? খুব কম পত্রিকায় এই ধরনের লেখকদের লেখা প্রকাশ করা হয়। সাহিত্য জগতে কি শুধু বিখ্যাত লেখকদের লেখাই প্রকাশিত হবে?

ঃ 'ছোট লেখক' কথার অর্থ কি? নতুন বা অখ্যাত লেখক? বর্তমানের বিখ্যাত লেখকরাও তো এককালে অখ্যাত নতুন ছিলেন। তখন তাঁদের ভাল লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলেই না আজ তাঁরা বিখ্যাত হতে পেরেছেন। যে কোন লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য তাড়াহুড়া না করে সত্যিকার সাহিত্য রচনায় মন দিলে তার কদর না হবার কারণ নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে শোনা যায়, কোন কোন পত্রপত্রিকায় নাকি গোষ্ঠীপ্রথা চালু আছে, গোষ্ঠীর বাইরের লেখকদের সেখানে প্রবেশলাভ সহজ নয়। এটা রটনাও হতে পারে।

শান্তনু ঘোষ, কলিকাতা-৫২

—অপমানে মানুষ কাঁদে কেন?

ঃ সবক্ষেত্রেই কি কাঁদে? সময় সময় রাগে জ্বলে ওঠে না? নিরুপায় হয়ে মানুষকে যখন অপমান হজম করতে হয়, তখনই সে কাঁদে মনের জ্বালায়।

—মনুষ্যত্ব কি? 'মানুষ হওয়া' কথার অর্থ কি?

ঃ মানবিক সৎ গুণগুলি অর্জন করা ও কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করাই মনুষ্যত্ব। এইসব গুণ অর্জন ও প্রয়োগ করার আন্তরিক চেষ্টাকেই বলা যায় মানুষ হওয়া।

বিমলেন্দু ত্রিপাঠি, পুরুলিয়া

—গান্ধীজী আর নেতাজী, এঁদের মধ্যে আপনার প্রিয় নেতা কে?

ঃ প্রশ্নটা ঘুরিয়ে তোমাকেই করছি। আর আমার কথা বলো কেন? ব্যক্তিগত মতামত দেবার বেলায় আমি এক পা এগোই তো, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ পা পেছিয়ে যাই। সেই আপ্তবাক্য আছে না, সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য—? উঁহুঁ। ঐ আপ্তবাক্যই আমার বর্ম, তার আড়ালেই সতত আত্মরক্ষা করে চলি।

—গান্ধীজীর অহিংসা নীতি আজকের বিশ্বে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে কি?

ঃ মনে তো হয় না। পৃথিবীতে যতদিন অসাম্য আছে, আছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ আর আছে অবিচার, অত্যাচার ও শোষণ আর দুর্বলের উপর সবলের বলপ্রয়োগ, ততদিন শান্তি আসার সম্ভাবনা কোথায়? অহিংসা নীতি প্রয়োগের সুযোগই বা কই—কে মানছে তা?

দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, খড়্গপুর

—সমস্ত মানুষ কি প্রতিভাবলে মহৎ ব্যক্তি হতে পারে?

ঃ মহৎ হতে পারে কিনা জানি না, তবে বড় হতে পারে। কিন্তু শুধু প্রতিভা থাকলেই তা হয় না। প্রতিভা-স্ফুরণের জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ, একাগ্রতা, অধ্যবসায় আর স্থির উদ্দেশ্য।

মোজাম্মেল হক, পশ্চিম দিনাজপুর

—আমি মনপ্রাণ দিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু 'কিশোর ভারতী'র মঙ্গল কামনা করি। 'কিশোর ভারতী' পেলেই মনে হয় যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি।

ঃ প্রার্থনা করি, কিশোর ভারতী যেন চিরকাল তোমাদের এমনি প্রিয় বন্ধু থাকতে পারে। আর কিশোর ভারতীর পক্ষ থেকে আমরাও কামনা করি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

—অনেক ছেলে ছাত্রজীবনে বিড়ি সিগারেট খেয়ে পড়া নষ্ট করে, ছাত্রজীবনটাকে হেলায় কাটিয়ে দেয়। তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে?

ঃ কি যে হবে, বুঝতেই পারছো। ঈশপের গল্পের সেই নিদারুণ শীতের সময়কার গ্রাস্‌হপ্যার বা ফড়িংয়ের অবস্থা আর কি!

বিশ্বজিৎ মেইকাপ, মেদিনীপুর

—আমি যখন ইংরেজী পড়তে বসি, তখন নতুন শব্দগুলো মুখস্থ করলেও মনে থাকে না। কেন, বলতে পারেন? যদি কোন ব্যায়াম বা ওষুধের কথা জানাতে পারেন, তবে খুব ভালো হয়।

ঃ আমার একটামাত্র ওষুধই জানা আছে। ওষুধটা খুব

ভালো আর ফলপ্রদ। তা হলো—try, try again। দেখবে, আন্তরিক চেষ্টা ও একাগ্রতার কাছে সব দুর্বলতাই পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না।

অমরনাথ মুদি, মেদিনীপুর

—আমাদের অধিকাংশেরই বয়স পনেরো থেকে সতেরো। অথচ কি নিদারুণ পাঠ্যসূচী! ক্লাসের পড়াই প্রতিদিন করতে পারা যায় না। কি করে আমরা খেলাধুলো করবো, কখন আমরা সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করবো?

ঃ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার, তোমাদের এই আকুতি ও আর্তনাদকে ভাষা দেবার ও সবার সামনে তুলে ধরার দায়িত্বই তো নিয়েছে কিশোর ভারতী। এ অন্যায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত, এ নিষ্ঠুরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিশোর ভারতী তার দায়িত্ব পালন করে যাবে। কত দিনে এই মারাত্মক অপব্যবস্থার ইতি ঘটবে, তাই ভাবি।

শ্যামাচরণ মিশ্র, জব্বলপুর

—ভাবছি আরো লিখবো, ভালো লিখবো। আমার রচনারও মূল্য আছে। কিন্তু কেমন করে ভালো লিখবো, কেমন করে এগোবো—এ সম্বন্ধে যদি দু-চার কলম লিখে দেন তো খুব ভালো হয়।

ঃ দেশী-বিদেশী বিখ্যাত লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পড়বে। খ্যাতনামা বাঙালী লেখকদের রসোত্তীর্ণ লেখা পড়ার সময় বারবার লক্ষ্য করবে তাঁদের রচনার ভাষা, ভাষার প্রয়োগ-কৌশল, পরিবেশন-পদ্ধতি ও প্রসাদগুণ। আর নিজে সব সময় লিখবে। কিন্তু লেখা তখুনি প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। বঙ্কিমচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি করে বলি—লেখাটা অন্ততঃ পাঁচ-ছ মাস রেখে দেবে, তারপর আবার সেটা পড়বে। তখন তুমি আর সে রচনার লেখক নও—পাঠক। লেখাটায় দোষ-ত্রুটি থাকলে, তোমার চোখে তখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এমনি ভাবে যদি পড়া ও লেখার কাজ নিয়মিত চালিয়ে যাও, তাহলে নিশ্চয়ই ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে।

বিজয়েন্দু মণ্ডল, নদীয়া

—ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। তাকে কি ভাবে দমন করা যায়?

ঃ মাথা ঠাণ্ডা রেখে, বিচারবুদ্ধি না হারিয়ে মনকে বশে রাখতে পারলেই এটা সম্ভব। মনে রেখ, যে সহে সে রহে।

—ভূত বা প্রেত জিনিসটা কি? ভূত কি মানুষের মনের দুর্বলতার অংশ, না কি অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়?

ঃ ভূতের সৃষ্টি মানুষের মনে, ভয় থেকে তার জন্ম। তার বাইরে ভূতের অস্তিত্ব নেই বলেই মনে করি। যুক্তিবাদী সবল সাহসী মানুষের চোখে ভূত কখনই ধরা দেয় না।

সুব্রত ভৌমিক, কুচবিহার

—বর্তমানে পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য বস্তু কি কি?

ঃ কোন্ সাতটার নাম করবো, বলো? বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারই তো এক-একটা পরমাশ্চর্য। রেলগাড়ি, মটরগাড়ি, উড়োজাহাজ, নানা যন্ত্রপাতি ও মেসিনপত্র, সাবমেরিন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সিনেমা, টেলিভিসন, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র, এক্স-রে, ক্যামেরা, কম্পিউটার, পারমাণবিক শক্তি, আধুনিক নানা যুদ্ধাস্ত্র, চিকিৎসা-জগতের নানা আবিষ্কার—আর কত চাও, আরো শুনতে চাও? এদের মধ্যে কোন্ সাতটাকে বর্তমান পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তু গণ্য করতে চাও, জানিও।

—শব্দ-হেঁয়ালী ছাড়াও অন্যান্য ধরনের ধাঁধা প্রকাশ করলে ভাল হয়।

ঃ হুকুম যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। যথাসময়ে তামিল হবে, আশা করি।

পাঁচু, টাবু, বরুণ, বৃন্দাবন ও শান্তিময়ী, ভাটপাড়া

—হঠাৎ যখন 'কিশোর ভারতী' হাতে এল, তার কার্টুন, গল্প, কবিতা, সবার উপরে তার শব্দ-হেঁয়ালি দেখে মন আমাদের নেচে উঠল। 'কিশোর ভারতী'র বিষয়বস্তু, ভাষা ও পরিবেশন সত্যি অভিনব এবং তার চেয়েও অভিনব আমাদের মাতৃভাষায় 'শব্দ-হেঁয়ালি'। এটা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু এবং এ থেকে এরই মধ্যে বহু শব্দ, যেগুলি অজানা ছিল, তা জেনে ফেলেছি। আমাদের মতে প্রতি সংখ্যায় শব্দ-হেঁয়ালি প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই রকম একটা অভিনব জিনিস অন্য কোন পত্রিকায় দেখা যায় না।

ঃ খুব খুশী হলাম। কিশোর ভারতী তোমাদের মুখপত্র তো, তাই তোমাদের সুন্দর ইচ্ছাগুলো পূরণ করাই তার কাজ।

বিমলকুমার শেঠী, মুর্শিদাবাদ

—ঘেরাও সম্পর্কে আপনার মত কি? এটা কি যুক্তিসংগত?

ঃ পাগল! আমি যাব এ সম্পর্কে মতামত দিতে?

—আমি পত্রবন্ধু করতে চাই। আমার বয়স সতের। আমার শখ ডাকটিকিট জমান, গল্পের বই পড়া, সাহিত্য পত্রপত্রিকা সংগ্রহ।

অসীমকৃষ্ণ দত্ত, জামসেদপুর

—আমি এই প্রথম কিশোর ভারতী পত্রিকা পড়লাম। পড়ে মনে হল, এত সুন্দর একখানা পত্রিকা থাকতেও এর খবর অনেক কিশোরই জানে না। কিশোর ভারতীকে শত শত ধন্যবাদ।

ঃ খুশী হলাম। কিশোর ভারতী যখন তোমাদেরই মুখপত্র, তখন দিকে দিকে তার নাম ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নেবে তো তোমরাই।

সৈয়দ আহসান জমিল, মুর্শিদাবাদ

—আমার মনে হয়, প্রিয় লেখকদের সম্পর্কে চিরদিনই আমাদের একটা তীব্র কৌতূহল রয়েছে, আর সেই কৌতূহল কিছুটা অন্ততঃ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মিটতে পারে। যেমন আমাদের মত বয়সে কার লেখা তাঁর ভাল লাগতো, কিভাবে তিনি ছোটদের রচনায় হাত দিলেন, ছোটদের সাহিত্য ও বর্তমানের কিশোর সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি, ইত্যাদি। কিংবা আমাদের প্রিয় লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও দিতে পারেন। অথবা এমনও করতে পারেন, লেখকরা নিজেদের ছেলেবেলার কথা, তাঁদের জীবনযাত্রার কিছুটা পাতা সংক্ষেপে নিজেরাই তুলে ধরবেন আমাদের

সামনে। আপনার সুচিন্তিত ও মিষ্টি মিষ্টি উত্তর, আশা করি, শীগ্‌গিরই দেবেন।

ঃ কি মুশকিল! কি মুশকিল! তোমার শেষ দিকের দাবি তিনটের উপর চোখ পড়তে না পড়তেই আমি প্রায় খতম। ইহ্‌! যেন এক-একটা থান ইট। সুচিন্তিত! মিষ্টিমিষ্টি!! শীগ্‌গির!!!—ব্যস্‌, আমার ধুলিশয্যা ততক্ষণে কম্‌প্লিট! ওর একটাও যে আমার আসে না! তাহলে—সটকাবো? নাঃ, সে উপায়ও নেই। সম্পাদকের রক্তচক্ষু যে হায়েনার মতো দিনরাত আমায় তাড়া করে ফিরবে! কী যে ফ্যাসাদ!

প্রিয় লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে তোমাদের কৌতূহল থাকতে পারে। কিন্তু তা মেটাতে তৎপর হওয়া কতখানি বুদ্ধিমানের কাজ, প্রশ্ন সেখানেই। প্রথম কথা, ছোটদের লেখক বলতে কাদের ধরবো? প্রায় সব লেখকই বড়দের জন্য লেখেন, ছোটদের জন্যও লেখেন। দ্বিতীয়তঃ, কে কে তোমাদের প্রিয় লেখক, সে বিচার কে করবে? সম্পাদক? তাহলেই হয়েছে। দু দিনেই তাঁর সম্পাদকত্ব খতম! তাঁকে খুঁজতে রাঁচী যেতে হবে না? আর তোমরা বিচার করবে? এ সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যে নানা-রকম মত থাকা স্বাভাবিক—আছেও। তৃতীয় যে কথাটা বলতে চাই, সেটাই সবচেয়ে গুরুতর। লেখকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে যে গা-শিরশির-করা মন-ছমছম-করা রোমাঞ্চকর অনুভূতি রয়েছে, তা সমূলে উৎপাটন করা কি উচিত হবে? স্বপ্নভঙ্গের পরেই তো আসে হতাশা। এই প্রসঙ্গে Yarrow নদী সম্পর্কে ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতার কথা মনে পড়ছে। কবি যত দিন না Yarrow দেখেছেন, ততদিন Yarrow সম্পর্কে তাঁর মনে কতই না মিষ্টিমধুর রোমাঞ্চকর কল্পনা! কিন্তু তারপর কি ঘটলো? Yarrow দেখার পর কবির সব স্বপ্ন বানচাল। আর পাঁচটা নদীর মতোই সাদামাঠা বৈচিত্র্যহীন নদী Yarrow। তাই দুঃখ করে কবি লিখেছেন, Yarrow না দেখলেই ভাল ছিল। তাহলে এরকম স্বপ্নভঙ্গ ও হতাশা জুটতো না—রঙিন মধুর অনুভূতিটা অন্ততঃ থাকতো। তোমাদের কাছেও আমার সেই বক্তব্য। অযথা মনস্তাপ ভোগ করে কি লাভ? আর নয়তো তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনগড়া গালগল্প ফাঁদতে হবে। এর চেয়ে লেখার মধ্য দিয়ে লেখকের যে ভাবমূর্তি আমাদের মনে গড়ে ওঠে, সেইটেই কি অধিকতর মনোরম নয়?

—শব্দ-হেঁয়ালি সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে। ছক পূরণের নিয়মাবলীতে আছে, "একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে; কিন্তু আমাদের দপ্তরে শব্দ-হেঁয়ালির ছক দুটি যেভাবে পূরণ করা থাকবে, তার সঙ্গে তোমার ছক দুটি মিললে তবেই সেটা সঠিক বলে গণ্য হবে।" কিন্তু এই নিয়মের শেষাংশ সম্পর্কে আমার দ্বিধা আছে। আপনাদের পূরণ করা ছকের সঙ্গে না মিললেই ভুল, এটা ভাবা উচিত নয়।

ঃ এছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই, ভাই। এক-একটা শব্দের বিভিন্ন রূপ বা অর্থ থাকতে পারে। তুমি তার কয়েকটা উদাহরণও দিয়েছ। তার কোনটাই ভুল নয়। কিন্তু প্রতিযোগিতা যেখানে, সেখানে কি করণীয়? সেখানে শব্দের একটাই রূপ বা একটাই অর্থ আমাদের ঠিক করে রাখতে হয়। প্রতিযোগীরা তার অন্য কোন রূপ বা অর্থ দিলে অভিধানগত প্রশ্নে কোন ভুল হয় না বটে, কিন্তু প্রতিযোগিতার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সেটাকে ভুল বলে গণ্য করা ছাড়া অন্য কোন্‌ পথ আছে? এটাই তো যুক্তিসঙ্গত।

নন্দ প্রামাণিক, মেদিনীপুর

—পূর্ব আকাশে শুক্রগ্রহকে ভোরের বেলা দেখা যায়, সন্ধ্যা বেলায় দেখা যায় না কেন?

ঃ বিজ্ঞানের যে কোন ভাল পাঠ্য বইতে এর জবাব পাবে।

ফাল্গুনী বসাক, হাজারীবাগ

—আমার স্বাস্থ্য একেবারেই নেই। তবে শরীরে কোন প্রকার রোগও নেই। শুধু সারা বছর সর্দি লেগে থাকে। স্বাস্থ্য ফিরে পাবার কোন উপায় যদি জানাতে পারেন, তবে আনন্দিত হব।

ঃ একমাত্র পন্থা নিয়মিত ব্যায়াম করা। তাহলে স্বাস্থ্য ফিরবেই। কি কি ব্যায়াম করবে, সে সম্বন্ধে গত বছরের কিশোর ভারতীর একাধিক সংখ্যায় ছবি সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনাগুলো পড়ে নিও।

দিব্যকান্তি নিয়োগী, ভুবনেশ্বর

—বুমেরাং-এর scientific explanation কি?

ঃ আজো বিজ্ঞানী মহল সঠিক বলতে পারেন না, বুমেরাং ছোড়ার পর কি করে আবার তা ছোড়ার জায়গায় ফিরে আসে।

মনোতোষ চন্দ, নবদ্বীপ

—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগারের নাম কি এবং কোথায়? কত বই আছে?

ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Washington, D. C.-তে অবস্থিত Library of Congress। ১৯৬২ সালের জুন মাস পর্যন্ত এর সংগ্রহ-সংখ্যা ছিল ৪১,৮৭৪,৯০০।

—ইস্টার্ন রেল ও বি. এন. আর. কি কলকাতার টীম?

ঃ তাই তো জানি।

শিপ্রা দাস, দুর্গাপুর-৪

—কিশোর ভারতী হাতে পেলে সব ভুলে যাই। গল্প কবিতা লেখার শখ আছে। কিশোর ভারতীতে লেখা পাঠাতে চাই। কিন্তু আমি তো গ্রাহিকা নই। তা হলে কি করতে হবে?

ঃ সোজা পথ গ্রাহিকা হওয়া, অবশ্য গ্রাহক-গ্রাহিকার আসরে যদি লেখা দিতে চাও।

চতুরকুমার কবিরাজ, বীরভূম

—প্যারাসুটের জন্ম কোথায়, কে কবে ইহা আবিষ্কার করেন, কে কবে ইহা প্রথম পরীক্ষাকার্যে চালনা করেন?

ঃ যতদূর জানা যায়, প্যারাসুটের কার্যকারিতার তত্ত্ব লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম প্রচার করেন।

এর কার্যকারিতা হাতেকলমে পরীক্ষিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে Sebastien Lenormand-ই প্রথম Montpellier মানমন্দিরের সুউচ্চ শীর্ষ থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে নীচে লাফিয়ে পড়ে এর উপযোগিতা প্রদর্শন করেন।

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, নৈহাটি

—চাঁদে মানুষ নেমেছে, মঙ্গল গ্রহ বা শুক্র গ্রহেও কি মানুষ নামতে পারবে বলে আপনি মনে করেন?

ঃ কেন নয়? বিজ্ঞানের বর্তমান জয়যাত্রায় গ্রহ তো কাছের বস্তু, ভবিষ্যতে একদিন সুদূর তারায় তারায় চলবে মানুষের অভিযান। কে বলতে পারে, সে অভিযানে তোমরাও অংশ নেবে কিনা?

—ভারতবর্ষের সত্যিকার মিত্র রাষ্ট্রগুলির নাম কি? অন্ততঃ আপনার মতানুযায়ী কোন্ কোন্ দেশ ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী?

ঃ এ ব্যাপারে কি কোন মতামত দেওয়া চলে, ভাই? ব্যক্তিগত জীবনে শত্রু-মিত্রের মধ্যে সীমারেখা টানার যে পদ্ধতি চালু আছে, রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তা অচল।

দেবাশীষ সাহা, কলিকাতা-৫২

—আমি যদি সূর্য সেন, বারীন ঘোষ, অরবিন্দ, সত্যেন, কানাইলাল প্রভৃতি অমর বিপ্লবীদের সম্বন্ধে লিখে পাঠাই, তা হলে কি তা ছাপা হবে?

ঃ কেন হবে না? উপযুক্ত বিবেচিত হলে অসুবিধা কোথায়?

—আমি পত্রবন্ধু চাই। আমার বয়স বার বছর। শখ ঃ দেশ বিদেশের বই, ছবি আর ডাকটিকিট সংগ্রহ করা, প্রধানতঃ জীবনী আর বিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়তে ভাল লাগে।

প্রিয়ব্রত রায়, মেদিনীপুর

—আপনার শ্রাবণ মাসের 'সওয়াল জবাব'-এ জানতে চেয়েছেন, অজানা আবিষ্কারের সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হল কেন? তার উত্তর লিখছি।

(১) বিজ্ঞান বিষয়ে কোন আবিষ্কার করলে বিজ্ঞানী অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সভায় তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করেন, কিন্তু ইনি রঙ্গমঞ্চে তাঁর নিজ আবিষ্কার দেখালেন।

(২) তিনি পেট্রোল আবিষ্কার সম্বন্ধে বৃটিশ ও আমেরিকার নৌবহরের বাঘা বাঘা কর্মচারীদের সামনে প্রমাণ করলেন। কিন্তু এতে কোন রাষ্ট্রই এই আবিষ্কার গ্রহণ করলেন না, বা বিজ্ঞানীরা উৎসাহ দেখালেন না। মনে হয়, এই মহান আবিষ্কারক ও আবিষ্কারকে অগ্রাহ্য করা হল।

(৩) কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সময় বিজ্ঞানী সহকারী রাখেন এবং ফর্মুলা লিখে রাখেন। বিজ্ঞানীর মৃত্যু হলেও এই ফর্মুলার সাহায্যে অন্যেরা তাঁর আবিষ্কার বুঝতে পারেন। এক্ষেত্রে তাও নেই। বিজ্ঞানীকে একক ও নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। আর যে সময় উল্লেখ করেছেন, সেই সময়টি ১৯৩৮ বা ১৯৩৯-এর মধ্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেই সময়ে এরূপ একটি আবিষ্কার কোন রাষ্ট্রই কিন্তু গ্রহণ করলেন না! এই সব কারণে গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

ঃ তোমার এই বিশ্লেষণমূলক গবেষণাটি পড়ে আমাদেরও সেই সন্দেহ হতে শুরু করেছে।

আশিসকুমার দত্ত, কলিকাতা-৫৪

—কিশোর ভারতীর আষাঢ় সংখ্যায় 'বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী 'নক্ষত্র' পড়লাম। কাহিনীর শেষে দেখলাম যে এটা H. G. Wales-এর 'The Star' অবলম্বনে লেখা। কাহিনীটা পড়ার পর কতকগুলো বিশেষ প্রশ্ন আমার মনে হয়েছে।

প্রথমতঃ আমরা জানি, H. G. Wales ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ছিলেন। তাঁর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সত্যই কি ১৯৯৯-২০০০ সালে এই রকম একটি নক্ষত্র পৃথিবীর কাছে এসে বিপর্যয় ঘটাবে?

দ্বিতীয়তঃ কাহিনীর শেষে বলা হয়েছে, শুক্র গ্রহের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন—। কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়া কর্তৃক প্রেরিত ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ শুক্র থেকে যে সব তথ্য পাঠিয়েছে তাতে জানা যায় যে, শুক্রে মানুষ কেন কোন জীব-জন্তুরই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং কাহিনীর শেষের বাক্যটি যে অসত্য, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাবে কি সমস্ত কাহিনীটাও মিথ্যা প্রমাণিত হয় না?

ঃ এর দ্বারা কাহিনীর সত্য-মিথ্যা কিছুই প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হয় বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য-রচনায় ওয়েল্‌সের অপূর্ব মুন্সিয়ানা ও কল্পনার ক্ষমতা। বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ওয়েল্‌স্ মূলতঃ ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন না। এসব মনে রেখে তাঁর গল্প পড়তে হবে, না হলেই বাধবে গণ্ডগোল।

এজেণ্ট হবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। 'কিশোর ভারতী' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম ৭৫ (পঁচাত্তর) পয়সা।

২। বাংলা আশ্বিন বা ইংরেজী অক্টোবর মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'র বর্ষারম্ভ।

৩। ভারতের সর্বত্র 'কিশোর ভারতী'র এজেন্সি দেওয়া হয়।

৪। ১০ কপির কমে পত্রিকার এজেন্সি দেওয়া হয় না।

৫। মফঃস্বলের এজেন্টদের কাছে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়। তবে যাঁরা আমাদের কার্যালয় থেকে নগদ মূল্যে সরাসরি পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের পত্রিকা-প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে জানাতে হবে।

৬। যেসব এজেন্ট ডাকযোগে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ৫্ টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয়। তবে যাঁরা আমাদের কার্যালয় থেকে নগদ মূল্যে সরাসরি পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ক্ষেত্রে এই টাকা জমা রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

৭। শতকরা ১০ খানা পর্যন্ত অবিক্রীত কপি ফেরৎ নেওয়া হয়। পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে উক্ত কপি আমাদের কাছে পৌঁছানো দরকার। যে ক'খানা কপি ফেরৎ পাঠানো হবে, পরবর্তী সংখ্যায় তা পূরণ করা হবে।

৮। এজেন্টের কাছে প্রেরিত ভি. পি. ফেরৎ হলে এবং তার সন্তোষজনক কারণ না দেখালে, এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৯। এজেন্সি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হলে, কর্মাধ্যক্ষের নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

গ্রাহক / গ্রাহিকা হবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। 'কিশোর ভারতী' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২। বাংলা আশ্বিন বা ইংরেজী অক্টোবর মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'র বর্ষারম্ভ।

৩। 'কিশোর ভারতী'র গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদার হার (সডাক) বার্ষিক ৯ (নয়) টাকা। বছরে 'কিশোর ভারতী'র অন্যূন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। বার্ষিক গ্রাহক/গ্রাহিকাকে এর জন্য কোন অতিরিক্ত দাম দিতে হবে না।

বৃহৎ-কলেবর বিশেষ সংখ্যার জন্য রেজেস্ট্রী ডাকব্যয় বাবদ অতিরিক্ত ৯০ পয়সা পাঠাতে হবে। নচেৎ সাধারণ বুক-পোস্টে পাঠালে বিশেষ সংখ্যাটি যথাস্থানে না পৌঁছাবার সম্ভাবনা।

৪। চাঁদার টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠাতে হয়, বা পত্রিকার কার্যালয়ে ঐ বাবদ নগদ টাকা জমা দিতে হয়। নগদ টাকা জমা দিলে অবশ্যই রসিদ নিতে হবে।

৫। বছরের যে কোন বাংলা মাস বা পত্রিকার যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

৬। মানি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে সম্ভাব্য গ্রাহক বা গ্রাহিকার পুরো নাম, ঠিকানা, বয়স, পিতার নাম বা অভিভাবকের নাম এবং পত্রিকার কোন্ সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তা সুবোধ্য ভাষায় স্পষ্ট করে লিখে জানাতে হবে।

৭। গ্রাহক বা গ্রাহিকাকে 'কিশোর ভারতী'র পক্ষ থেকে সদৃশ্য গ্রাহক-নিদর্শনপত্র দেওয়া হবে। তাতে গ্রাহক-নম্বর, নাম, ঠিকানা, বয়স প্রভৃতি বিষয় দেওয়া থাকবে।

৮। প্রতি ইংরেজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকার সংখ্যা না পেলে, ঐ মাসের ২২ তারিখের মধ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে তা অবশ্যই জানাতে হবে।

৯। কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা, ইচ্ছা করলে, গ্রাহক নিদর্শনপত্র বা চাঁদা জমার রসিদ দেখিয়ে পত্রিকার কার্যালয়ে এসে সরাসরি পত্রিকা নিতে পারবে। সরাসরি কার্যালয় থেকে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পত্রিকার সেই সংখ্যা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে পত্রিকার কার্যালয়ে সেই মর্মে জানাতে হবে। কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা তার কপি রেজেস্ট্রী ডাকযোগে নিতে চাইলে, তাকে রেজেস্ট্রী খরচ বাবদ বছরে অতিরিক্ত ১০·৮০ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।

১০। গ্রাহক-গ্রাহিকারা সমস্ত চিঠিপত্রাদিতেই গ্রাহকনিদর্শন-পত্র অনুযায়ী গ্রাহক-নম্বর, নাম, ঠিকানা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে লিখবে। যাদের তখনও গ্রাহক-নিদর্শনপত্র দেওয়া হয়নি, তারা নিজেদের 'নতুন গ্রাহক' বলে এবং কোন্ মাস থেকে গ্রাহক হয়েছে, তা উল্লেখ করবে।

১১। ঠিকানা বদল হলে, সঙ্গে সঙ্গেই অন্ততঃ সেই ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে জানাতে হবে।

১২। এতৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষের নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। লেখা বা রচনা (গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ইত্যাদি), আঁকা ছবি প্রভৃতি প্রকাশের জন্য পাঠাবার সময় লেখক বা শিল্পীর পুরো নাম ও ঠিকানা অবশ্যই দিতে হবে, নচেৎ তা বিবেচিত হবে না।

২। মনোনীত লেখা বা রচনা, আঁকা ছবি প্রভৃতি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে, তা জানানো সম্ভব নয়।

৩। লেখা বা রচনাদি সম্পাদনা করার বা পরিবর্তনাদি সাধনের পূর্ণ অধিকার পত্রিকা-সম্পাদকের থাকবে।

৪। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ভাবে কালি দিয়ে লিখে পাঠাতে হবে। বানানে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন বাঞ্ছনীয়।

৫। হাতে আঁকা ছবি ভাল সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চাইনিজ কালিতে পরিষ্কার ভাবে এঁকে পাঠাতে হবে।

৬। লেখা, ছবি প্রভৃতির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে জানানো বা অমনোনীত লেখা, ছবি প্রভৃতি ফেরৎ পাঠানো কিংবা ঐ সংক্রান্ত চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে ডাকটিকিট না থাকলে অমনোনীত রচনাদি নষ্ট করে ফেলা হয়।

৭। গ্রাহক-গ্রাহিকারা লেখা, ছবি, ধাঁধা, প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি বা ঐসব সংক্রান্ত চিঠিপত্র পাঠাবার সময় গ্রাহক-নম্বর, পুরো নাম, ঠিকানা, বয়স পরিষ্কার করে লিখবে। যাদের তখনও গ্রাহক-নম্বর দেওয়া হয় নি, তারা নিজেদের 'নতুন গ্রাহক' বলে এবং কোন্ মাস বা সংখ্যা থেকে গ্রাহক হয়েছে, তা উল্লেখ করবে।

৮। এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সম্পাদক বা কর্মাধ্যক্ষের নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে:

কিশোর ভারতী ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯ ফোন: ৩৪-৩১৫৭ ও ৩৫-১৯৪৪

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

অমৃত

অমৃত সংবাদঃ "কিশোর ভারতী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ থেকেই এর বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ গুণীজনের প্রশংসিত। আমরা এই পত্রিকাটির শুভকামনা করেছিলাম। মাত্র এক বছরেই কিশোর ভারতী কেবল কিশোরদের মধ্যেই শুধু নয়, সমস্ত শ্রেণীর পাঠকের সমাদর লাভ করেছে। **এবারের সুবৃহৎ শারদ সংকলনটি বৈচিত্র্যময় রচনা সমাবেশ, অংগসজ্জা এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠের দাবি করতে পারে।**....."

যুগান্তর ঃ ছোটদের পাততাড়ি

যুগান্তর (ছোটদের পাততাড়ি) ছোটদের পুজোর মজা প্রসংগে লিখেছেনঃ ".....মজা কি একটা? পুজোটাই তো মজা। প্রতিমা দেখা আছে—আছে বাজনা গান, আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। নতুন জামা কাপড় জুতো আছে, যার যেমনটি মেলে, কারুর কারুর আছে বেড়াতে যাওয়া, কাছে কি দূরে। এ সবের সংগে আরেকটা মজার কথাও ভোলবার নয়। ছোটদের জন্যে এই পুজোর সব লেখা। ছোটদের জন্যে সে হল আরেক আনন্দের হাট।.....ফি বছর ছোটদের জন্যে এই পুজোর সময় কয়েকটি বার্ষিকী বার হয়।.....**এবার ছোটদের আর একটি নতুন বন্ধু এসে বাজার মাৎ করেছে। ছোটদের সম্বৎসরের কাগজ যে একাধারে সার্কাস চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম খেলার মাঠ যাত্রার কথকতার আসর আর সেই সংগে দূর দূরান্তরের পাড়ি হওয়া উচিত, যুগান্তরের পাততাড়ির মত 'কিশোর ভারতী'তেও সেই কথা মনে রেখে মেলা সাজানো হয়েছে।** ছোটদের জন্যে লেখায় শুধু ভারে নয়—সত্যি যারা ধারে কাটেন এমন সব লিখিয়ে আর আঁকিয়ের সেখানে সমাবেশ হয়েছে।"

সাপ্তাহিক বসুমতী

সাপ্তাহিক বসুমতী-র মূল্যবান অভিমতঃ "একথা জোরের সংগেই বলা যায়, **'কিশোর ভারতী' আবির্ভূত হয়েই শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারত জয় করেছে। তার শারদীয়া সংখ্যাটি আরো অপূর্ব, আরো অসাধারণ। সারা ভারতে এতো ভালো কিশোর পত্রিকা আর নেই।** আমরা গত বছর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, যা নেই ভারতে, তা আছে কিশোর ভারতীতে। আমাদের কথা সত্যি কি না তা ছেলেরাই বলুক।.....বাংলাদেশের ওই সেরা সংকলনে প্রায় একশ' সেরা লেখক আছেন—ছেলেদের বড়দের মন জয় করতে যাঁদের জুড়ি নেই।"

বিদ্যোদয়ের বই

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি — সমরজিৎ কর

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত একটি দ্বীপের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে 'স্কুইরেল' নামে একটি মালবাহী জাহাজের নাবিকরা কে'চো খুঁড়তে সাপ বের করার মতোই একদিন খোঁজ পেল ভয়ংকর সেই মানুষটির, একমাত্র যার উদ্ভট মগজেই বুঝি জেড রশ্মি গজাতে পারে। ওকে অর্থাৎ পিয়ার্সনকে ধ্বংস করতে গিয়ে সকলের কি অবস্থা হয়েছিল বিজ্ঞানাশ্রয়ী ও অ্যাডভেঞ্চারধর্মী এই উপন্যাসটি তারই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী॥ [মূল্য : ৩·২৫]

কঙ্কাবতী [২য় সংস্করণ] — ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বহুর মধ্যে একটি অভিমত : "মৃদু মৃদু ব্যঙ্গ শ্লেষ এবং তিরস্কারের সঙ্গে উদ্দাম উদ্ভট এবং উধাও করা কল্পনা আর প্রচুর পরিমাণে কৌতুকরস মিশিয়ে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে যে বিরাট দান রেখে গেছেন কঙ্কাবতী তারই একটি অংশ।..." [যুগান্তর]

[মূল্য : ৩·৫০]

অথ ভারত কথকতা [২য় সংস্করণ] — শ্রীকথকঠাকুর

বহুর মধ্যে দুটি অভিমত : "গ্রন্থের লেখক ছদ্মনামে অবতীর্ণ হলেও তিনি পাকা লেখক। লেখক কথকতার সুরে গল্প-রস পরিবেশন করেছেন...যার আকর্ষণ বহু আবৃত্তিতেও ম্লান হয় না। বইখানি মুখ্যত ছোটদের জন্য, কিন্তু বড়রাও পড়ে খুশি হবেন।" [আনন্দবাজার পত্রিকা]

"(লেখক) মূল গল্পটিকে রাখিয়া তাহাতে নূতন 'রক্ত-মাংস ও মজ্জা' যোজনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই কাজ তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় সমাধা করিয়াছেন। দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করিতে হয় যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই বই পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবে।" [দেশ] [মূল্য ৩·০০]

সুশীল জানার

গল্পময় ভারত প্রথম খণ্ড — গল্পময় ভারত দ্বিতীয় খণ্ড

বহুর মধ্যে একটি অভিমত : "...ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে যে অতুলনীয় কাহিনীসম্পদ রহিয়াছে, বলিতে গেলে তাহাই মন্থন করিয়া শ্রীজানা এই গল্পগুলি সংকলন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য উপনিষদ, জাতক, ধম্মপদ, জৈনকথা, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বাসবদত্তা, হর্ষচরিত, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, স্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি ২২ খানি গ্রন্থ হইতে ২৮ টি গল্প তিনি চয়ন করিয়াছেন। এই অতুলনীয় গল্পসম্পদ যে ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে, তাহার সহিত রূপকথা বলার ভঙ্গী মিশান থাকায় গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে।...গল্পগুলি দেশের ছেলেমেয়েদের প্রাচীন যুগের মানুষদের সত্য-প্রীতি, দেশাত্মবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিত করিবে। 'গল্পময় ভারত'কে আমরা বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া অভিনন্দন করিতে পারি।" [যুগান্তর] [মূল্য : প্রতি খণ্ড ৩·০০]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন : ৩৪-৩১৫৭